৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ১৩

টপিক:

- **বাংলাদেশের পরিবেশ এবং প্রকৃতি:** জলবায়ুর হুমকি থেকে মুক্তির উপায়, পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশের উদ্যোগ ইত্যাদি।
- **বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ:** প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থান, ব্লু-ইকোনমি ইত্যাদি।

Lec-13

1. পরিবেশ / জলবায়ু ইস্যু (IR, BA, রচনা)
2. Blue economy
3. সীমান্ত (অবৈধ প্রবেশ, মাদক, অস্ত্র) (Map)

Lec-14

1. রোহিঙ্গার Issue
2. SDG
3. বাংলাদেশের উন্নয়ন

৪৩ বিসিএস

IR

⊕ বাংলাদেশ (৩৫)

English

বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

➲ সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরুঅঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী নিচু দেশসমূহ তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমন দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকা দেশ বাংলাদেশ। সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো:

- IPCC এর তৃতীয় সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১১ শতাংশ ভূখণ্ড সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাবে। এ প্রতিবেদন অনুসারে, ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১.৮ সেন্টিমিটার হতে ৫৯ সেন্টিমিটারে উন্নীত হবে।
- Institute for Water Modelling এর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩২ সেন্টিমিটার বাড়লে বাংলাদেশে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তর ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের ৮৪ শতাংশ সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- Bangladesh Centre for Advanced Studies এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ সেন্টিমিটার বাড়লে বাংলাদেশের জনজীবনে আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে।
- UNFCCC এর দেয়া তথ্যমতে, ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের অন্তত ১৭% ভূমি সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে।
- ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা DFDI ও এই একই পরিমাণ উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের প্রায় এক পঞ্চমাংশ সমুদ্রে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।
- বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দশম।
- সার্কের "আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র" (SMRC)-এর একটি গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে হিরণ পয়েন্ট, চর চেঙ্গা, এবং কক্সবাজারে জোয়ারের পানির স্তর প্রতি বছর যথাক্রমে ৪.০ মিলিমিটার, ৬.০ মিলিমিটার এবং ৭.৮ মিলিমিটার বেড়েছে।

বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

➲ উদ্বাস্তু সমস্যা

সমুদ্রস্তরের এই উচ্চতা বৃদ্ধির ফলাফল হিসেবে বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রায় ২ কোটি মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা প্রদত্ত হিসেব থেকে দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ১০ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রতিবছর প্রায় ৪ লাখ জলবায়ু উদ্বাস্তু ভিড় জমাচ্ছে। ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলেই রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে তলিয়ে যাওয়া অঞ্চল থেকে ২০৫০ সাল নাগাদ ৩ কোটি মানুষ গৃহহীন হতে পারে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সংবাদ মতে, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১-১.৫ কোটি মানুষ বড় বড় শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিপুল সংখ্যক (প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ) মানুষ ছেড়েছে খুলনার কয়রা এলাকা; পাড়ি জমিয়েছে ঢাকা, রাঙ্গামাটি কিংবা খুলনা সদরে।

বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

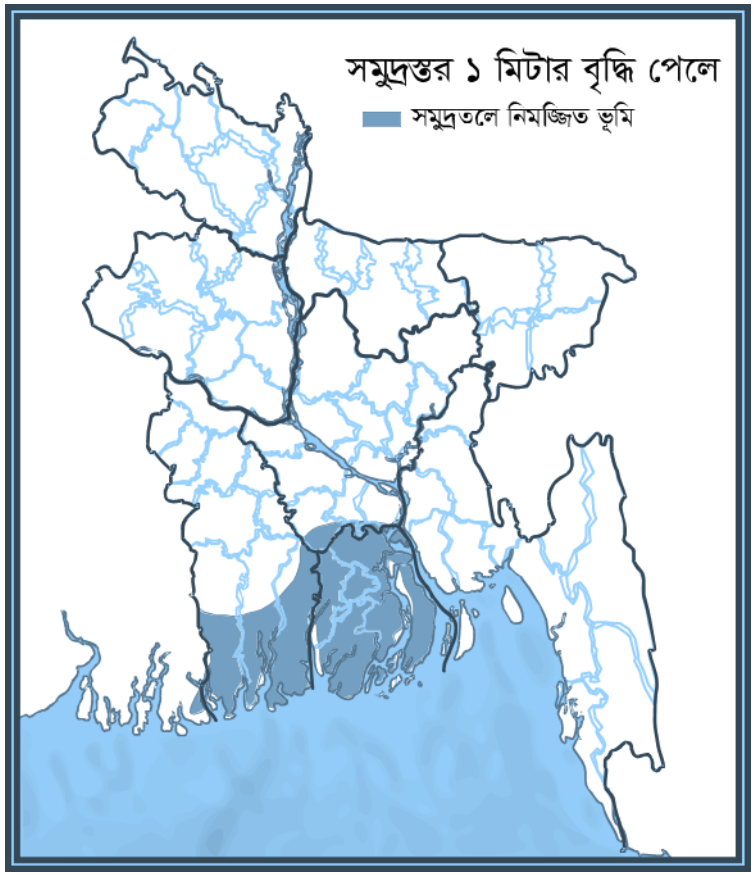

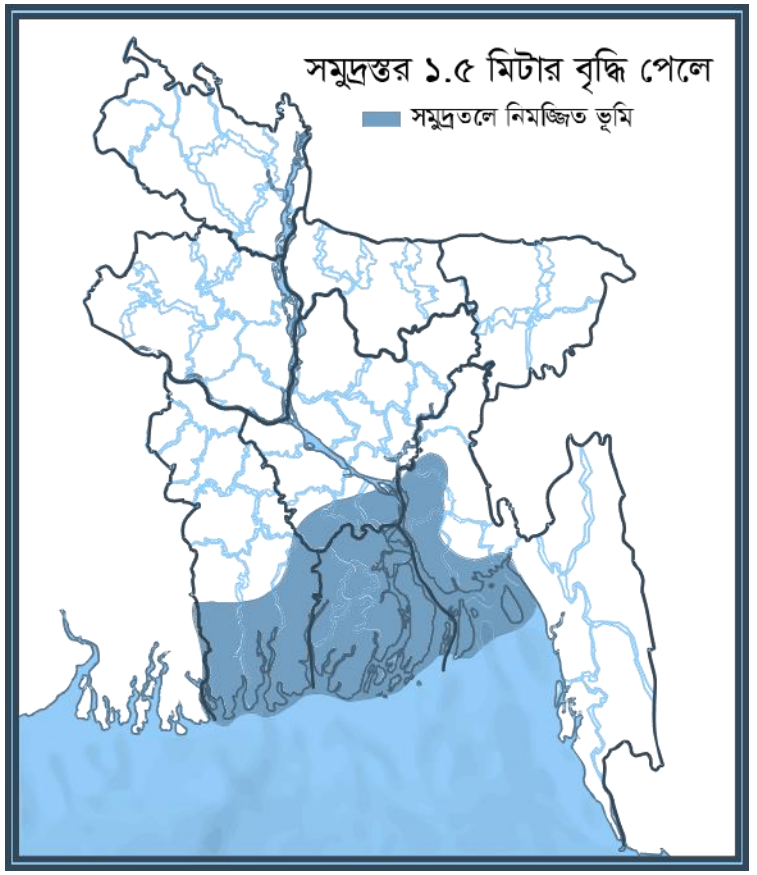

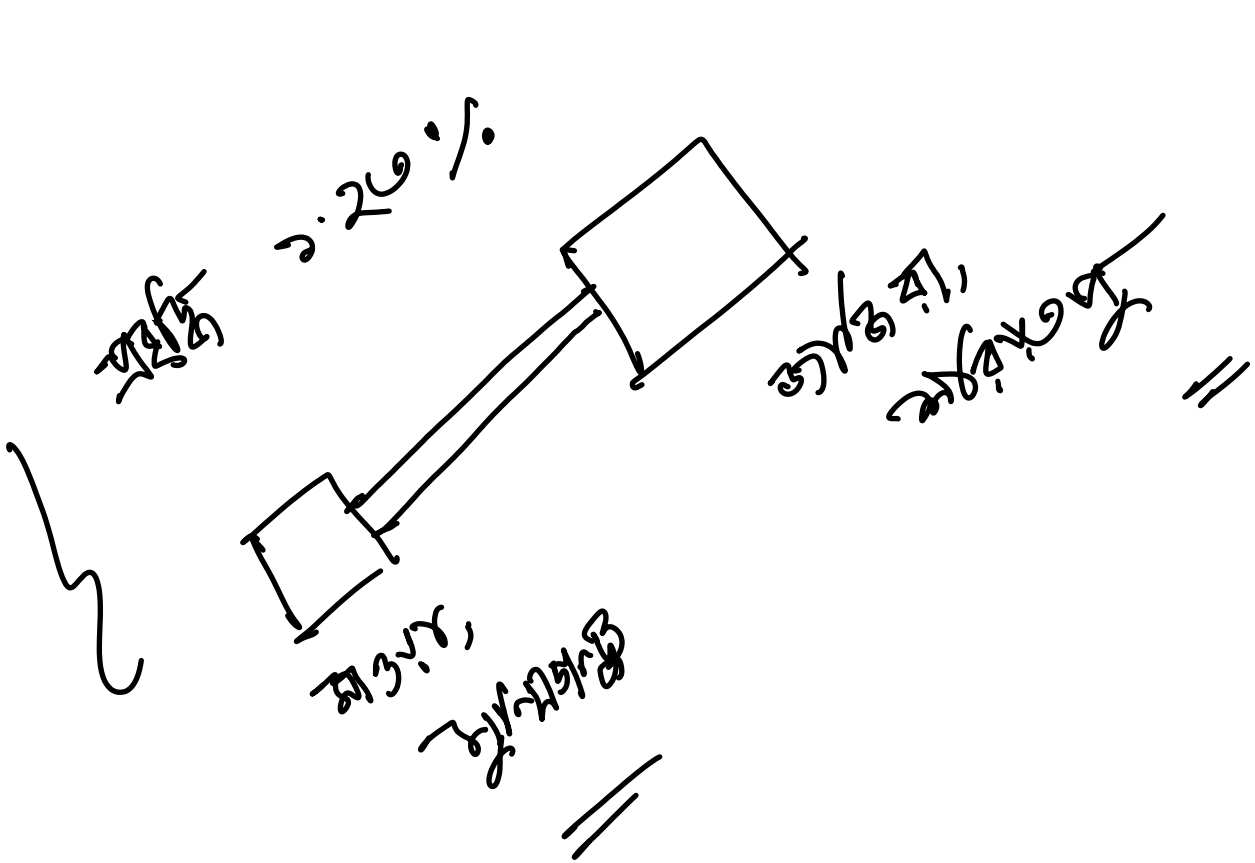

Development

1. GDP

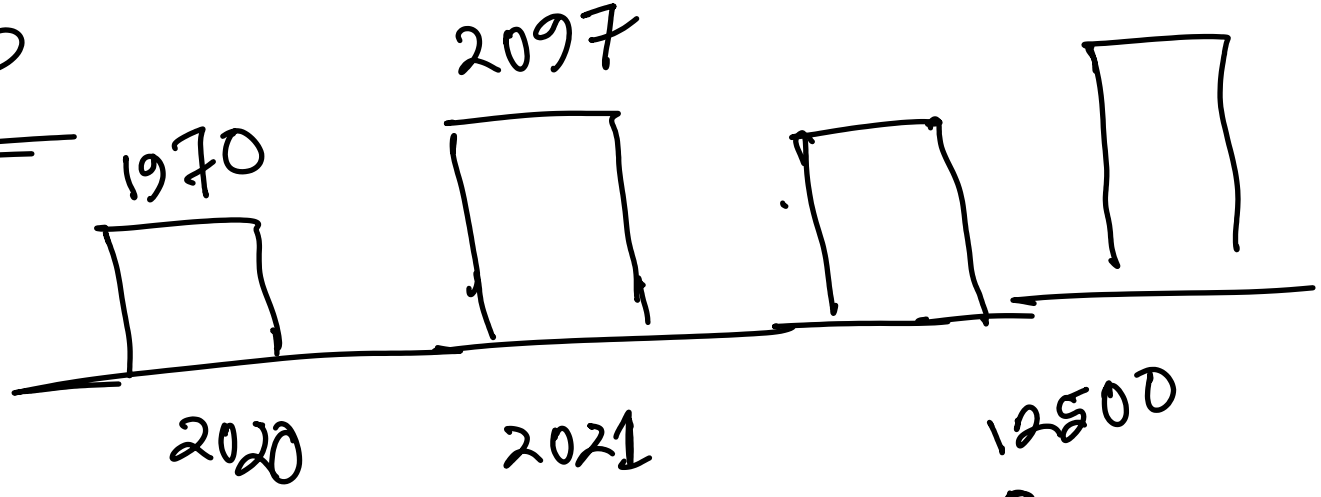

2. Per capita income

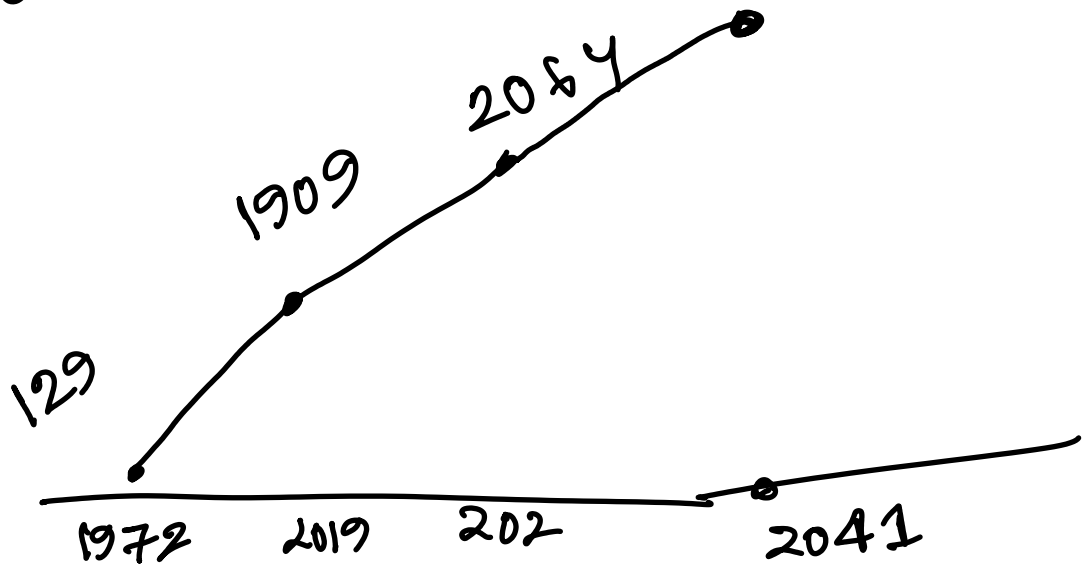

Economic Review

SDG

#8

1. No poverty

2. Zero Hunger

3.

4.

বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

১) বৃষ্টিপাত হ্রাস ও মরুকরণ

বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রার দেশ হিসেবে পরিচিত হলেও বিগত কয়েক বছরে তাপমাত্রার অস্বাভাবিক আচরণ সেই পরিচিতি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরসূত্রে জানা যায়, গত ৫০ বছরে দেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ০.৫%। এমনকি ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বাংলাদেশের তাপমাত্রা গড়ে ১.৪০ সেলসিয়াস এবং ২১০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ২.৪০ সেলসিয়াস বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দিনে দিনে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে গিয়ে খরায় আক্রান্ত হচ্ছে বিপুল সংখ্যক মানুষ, এর মধ্যে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের লোকই বেশি। এরকম খরায় কত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার ব্যাপারে বিভিন্ন উৎস থেকে আলাদা আলাদা উপাত্ত পাওয়া যায়। কারো মতে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ খরায় উদ্বাস্তু হবে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ।

বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি ফল হলো বাংলাদেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও মাত্রা বেড়ে যাওয়া। বিশেষ করে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত বাংলাদেশে এখন প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সমুদ্রস্তরের উচ্চতাবৃদ্ধি এবং উপকূলে লবণাক্ততা বাড়ায় সূর্যের তাপে তুলনামূলক ঘন লোনাপানি বেশি তাপ শোষণ করে গরম হয়ে উঠে স্বাভাবিক তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ফলে লবণাক্ততা-আক্রান্ত উপকূলাঞ্চল তুলনামূলক গরম হয়ে উঠছে দিনে দিনে। গাছ কম থাকার কারণে এবং পানি দীর্ঘক্ষণ তাপ ধরে রাখায় এই গরম স্থায়িত্ব পায়। এ ধরনের সীমিত অঞ্চলভিত্তিক জলবায়ুর পরিবর্তন ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও মাত্রা বৃদ্ধি করছে।

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় ঝড়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের দেয়া তথ্য মতে, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিলের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের পর ১৯৯৫, ১৯৯৭, ২০০০ ও ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে জল-ঘূর্ণিঝড় হলেও তা তেমন ক্ষয়ক্ষতি করেনি। ২০০১ থেকে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বলতে গেলে তেমন কোনো ঘূর্ণিঝড়ই হয়নি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনে এরপর থেকে একদিকে যেমন বাড়ছে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা, তেমনি বাড়ছে সংখ্যা। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডর, ২০০৮ সালে ঘূর্ণিঝড় নার্গিস, একই বছর ঘূর্ণিঝড় রেশমি, ঘূর্ণিঝড় খাইমুক এবং নিসা; ২০০৯ সালে বিজলি এবং ঐ বছরই আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় আইলা। ২০১৯ সালেই ফণী ও বুলবুল নামে দুইটি ঘূর্ণিঝড় আঘাত করেছিল। এসব ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষত নিয়ে এখনও মানবেতর জীবন-যাপন করছে বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক উপকূলীয় মানুষ।

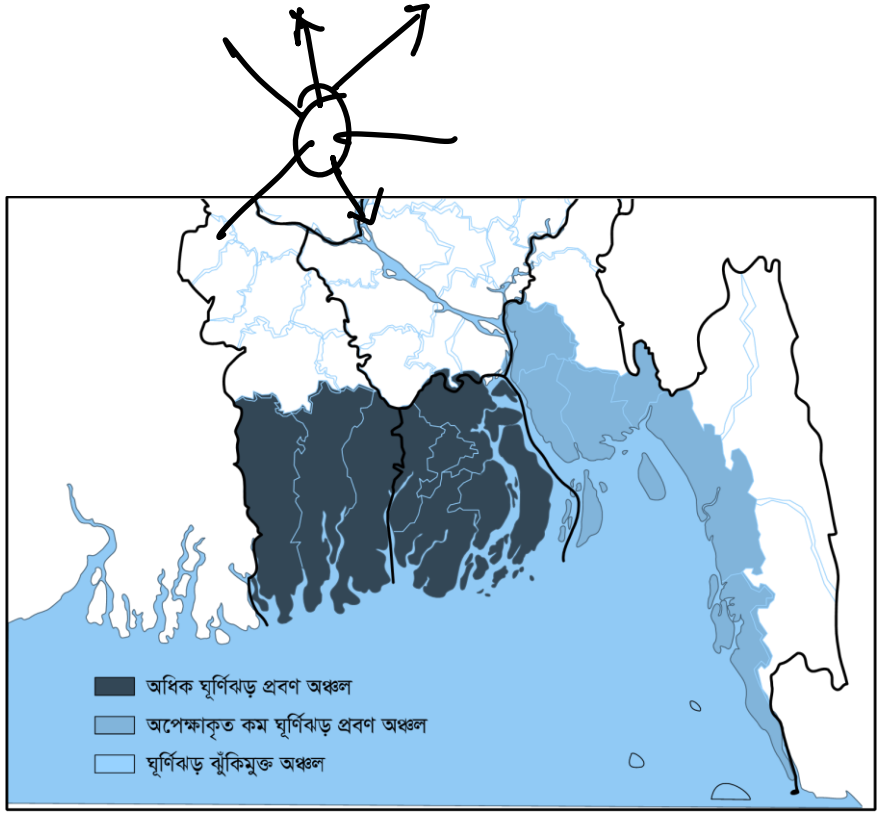

বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

➲ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি

ঘূর্ণিঝড়ের সাথে উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে জলোচ্ছ্বাস, তাতে তলিয়ে যায় উপকূলবর্তী হাজার হাজার একর স্থলভাগ। জলোচ্ছ্বাসের কারণে সমুদ্র থেকে আসা লোনা পানি উপকূলীয় এলাকার স্বাদু পানিকে লোনা করে দেয়। এছাড়া বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় বন্যার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং (IWM) এর গবেষণামতে, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের বন্যার পর দেশে বন্যাপ্রবণ এলাকার পরিমাণ ১৮% বেড়েছে এবং বর্তমানে পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের ৩৪টি শহর বন্যার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বন্যায় উদ্বাস্তু হবে বিশ্বের প্রায় ৭ কোটি মানুষ। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি বজ্রপাতে অপমৃত্যুর সংখ্যাও বৃদ্ধি করছে। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা ১০ সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে সেখানে বজ্রপাতের ঘটনা ১২% বৃদ্ধি পায়। এদিকে গত সাত বছরে বাংলাদেশে প্রায় ২ হাজার মানুষ শুধু বজ্রপাতেই মৃত্যুবরণ করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

➲ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ গ্রহণ

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণীত হয়েছে। ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পরিকল্পনাটির অনুমোদন দেওয়া হয়। নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করা হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের সহায়তায় পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) এটি বাস্তবায়ন করেছে। এই মহাপরিকল্পনার আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার যা GDP এর ২.৫ শতাংশ।

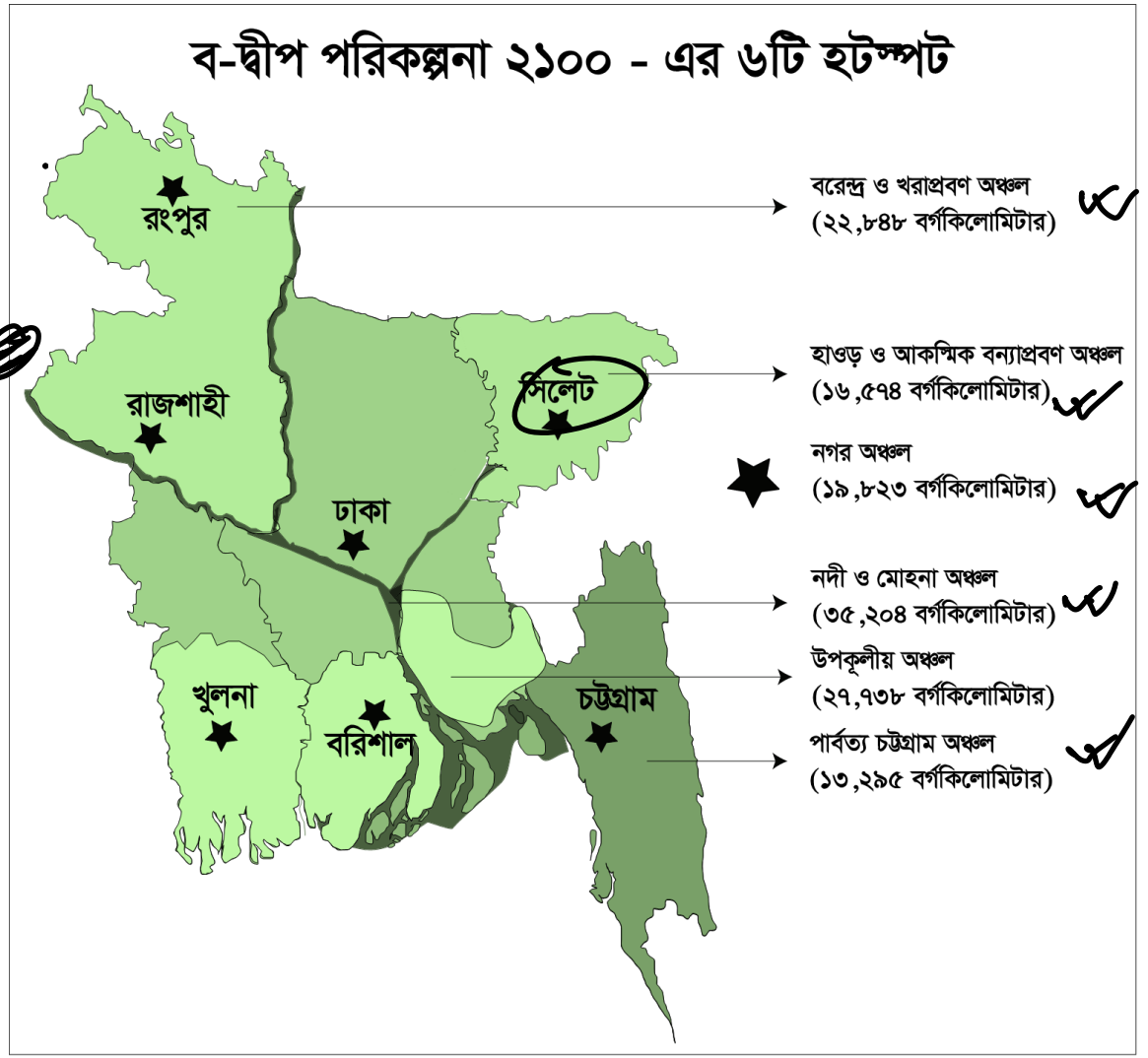

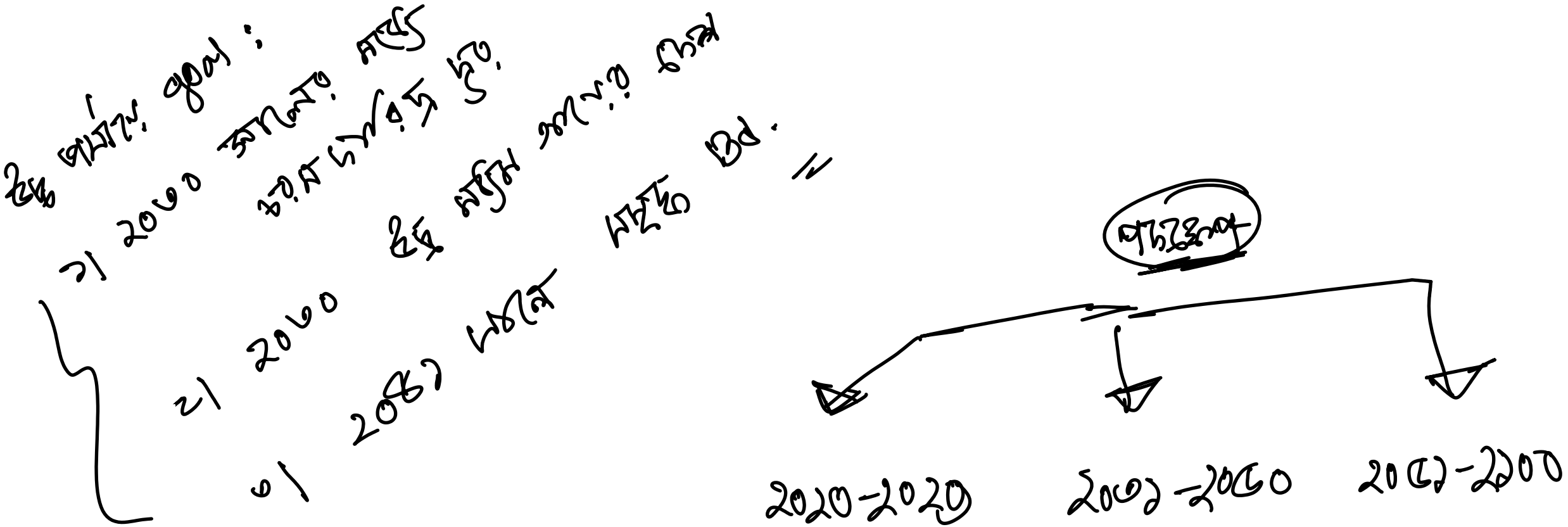

জলবায়ু পরিবর্তনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

➲ জলবায়ু ট্রাস্ট তহবিল গঠন

পৃথিবীর প্রথম এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশই সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ২৪ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টটি গঠন করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-১০ এর ধারা ৩ মোতাবেক।

জলবায়ু পরিবর্তনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

➲ শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

➢ **পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান:** শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার ব্যবস্থা, শব্দ প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা, বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থাসহ সকল প্রকার প্রশমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পর পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করে থাকে। এছাড়া, নিজস্ব লোকবল ও যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার শর্তও ছাড়পত্রে উল্লেখ করে দেয়া হয়।

➢ **ইটিপি (ETP) স্থাপন:** পানি দূষণ রোধে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ফলে অধিকাংশ পানি দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ইটিপি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। । শতকরা ৮২ ভাগ তরল বর্জ্য উৎপন্নকারী শিল্প-কারখানাকে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ETP) স্থাপনসহ পরিবেশগত আইন প্রতিপালনের আওতায় আনা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- **জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন:** তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপন্ন তরল বর্জ্য প্রকৃতিতে নির্গমন না করে পরিশোধনপূর্বক পুনঃব্যবহার করেছে ২০১৪ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত। পরিবেশ অধিদপ্তর মোট ৬২৪টি তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

- **এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম:** বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এর অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং কর্তৃক বিগত জুলাই ২০১০ হতে জানুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের জন্য ১১,৮৮৩ টি নদী দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৪৮৪.৭৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান: নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট শাখাসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছে। পাশাপাশি র‍্যাব, পুলিশ, সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সারাদেশে পলিথিন বিরোধী অভিযান চালানোর জন্য ৮টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম: পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ২২ টন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে ৮ টন, রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ১৬ টন এবং কক্সবাজার পৌরসভায় ১২ টন উৎপাদন ক্ষমতার ২টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে উৎস থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণের লক্ষ্যে বাসা বাড়িতে বিতরণের জন্য মোট ১০,১৭৪ টি সবুজ (জৈব বর্জ্যের জন্য) ও হলুদ (অজৈব বর্জ্যের জন্য) বিন সরবরাহ করা হয়েছে এবং সংগৃহীত বর্জ্য পরিবহণের জন্য একটি করে বিশেষ ট্রাক সরবরাহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ কম্পোস্ট প্ল্যান্টে জৈবসার উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ শুরু হয়েছে। এছাড়াও ফেনী ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় ২টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ফেনী পৌরসভায় কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (১৮(ক))

জলবায়ু ও ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও মানুষের অবিবেচক কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য এখন হুমকির সম্মুখীন। এ কারণে সংবিধানের ১৮ (ক) নং অনুচ্ছেদে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে। ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬' প্রণীত হয়েছে।

ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান

জাতিসংঘ ঘোষিত জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা, ২০১১-২০২০ এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে National Biodiversity Strategy and Action (NBSAP)-2016-2021 প্রণয়ন করা হয়েছিল।

জলবায়ু পরিবর্তনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

Plan এ কর্ম-পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো:

- **ব্লু-ইকোনোমি সংক্রান্ত কার্যক্রম:** সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্র দূষণ রোধ, সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও সমুদ্রসম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনোমি কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করাও ব্লু ইকোনমির অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী 'জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় ও সমুদ্রসম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীব সম্পদের সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার তৈরি' এবং 'সমুদ্র প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দূষণের প্রভাব পরিবীক্ষণ কার্যক্রম' বাস্তবায়নের জন্য একাধিক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে।

- **সামুদ্রিক দূষণ পরিবীক্ষণ:** সমুদ্র দূষণ মনিটরিংয়ের জন্য বঙ্গোপসাগরের ৪টি পয়েন্ট যথা-কর্ণফুলি মোহনা, পতেঙ্গা সৈকত থেকে এক কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখী, পতেঙ্গা চরপাড়া, সিইপিজেড থেকে এক কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখে নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- **ওজোন স্তর সংরক্ষণ:** বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে। এই প্রটোকলের পরবর্তী সংশোধনীগুলোও অনুমোদন করে। সরকার ১৯৯৫ সালে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি কমিটি গঠন করে। ১৯৯৬ সালে "ওজোন সেল" গঠন করা হয়েছে। এ সেল মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকার ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করেছে। এছাড়া, ওজোন স্তর রক্ষায় বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্টদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের এ অনন্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১২ ও ২০১৭ সালে মন্ট্রিল প্রটোকলের সফল বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে মন্ট্রিল প্রটোকলের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সরকার ওজোনস্তর ক্ষয়কারী অবশিষ্ট দ্রব্যের ব্যবহার সম্পূর্ণ ফেইজ আউট করতে ও অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে পালনে সক্ষম হবে।

পরিকল্পিত
বিন্যাস

Govt
গৃহীত
পদক্ষেপ

Map
চিত্র

কৃষি সম্পদ

- **ধান:** ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। ধান উষ্ণ জলবায়ুতে, বিশেষত পূর্ব-এশিয়ায় ব্যাপক চাষ হয়। ধান বীজ বা চাল সুপ্রাচীনকাল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রধান খাদ্য। দেশের ৮০ ভাগ আবাদি জমিতে ধান চাষ হয়। ধান চাষের জন্য ১৬° – ৩০° তাপমাত্রা এবং ১০০ – ২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি প্রয়োজন। ধানের উচ্চ ফলনশীল জাতকে উফশী বলা হয়। আশির দশক থেকে এদেশে উফশী ধানের চাষ জনপ্রিয় হতে শুরু করে। এদেশে বেশ কিছু বিশেষায়িত ধান জন্মে। এদের মধ্যে, কাটারিভোগ ধান সবচেয়ে ভালো হয় দিনাজপুরে। বাংলাদেশের কাটারিভোগ ধান ১৭ জুন, ২০২১ সালে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। কালিজিরা ধান সবচেয়ে ভালো হয় চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে। ধান উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চীন এবং রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ ভারত। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয়।

কৃষি সম্পদ

মৌসুম অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের ধানের বৈশিষ্ট্য

ধান	চাষের উপযোগী সময়	কাটার উপযোগী সময়	বিবরণ
আউশ	চৈত্র–বৈশাখ	আষাঢ়–শ্রাবণ	৮০–১২০ দিনের মধ্যে পাকে। একে আষাঢ়ী ধানও বলে। বৃষ্টি নির্ভর ধান। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আউশ ধান উৎপাদনের পরিমাণ ৩৬.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন।
আমন	শ্রাবণ–ভাদ্র	কার্তিক–অগ্রহায়ণ	আমন ধান মূলত দুই প্রকার যথা– (১) রোপা আমন ও (২) বোনা আমন। রংপুরে সবচেয়ে ভালো ফলন হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমন ধান উৎপাদন হয় ১৬৩.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন।
বোরো	কার্তিক মাস	জ্যৈষ্ঠ	প্রধানত সেচ নির্ভর ধান। সেচ জমির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করে। একে বাসন্তিক ধানও বলা হয়। সিলেটে সবচেয়ে ভালো ফলন হয়। বাংলাদেশের প্রধান ও সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত ধান। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বোরো ধান উৎপাদনের পরিমাণ ২১৫.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন।

কৃষি সম্পদ

❑ **গম:** গম বাংলাদেশের শীত মৌসুমে উৎপন্ন হয়। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান দানাদার ফসল। বাংলাদেশের আবহাওয়া গম ভালো হওয়ার জন্য খুবই উপযোগী।

- দেশে বছরে মোট গমের চাহিদা ৩০–৩৫ লাখ মেট্রিক টন।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা– ২০২৩ অনুযায়ী দেশে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট গমের উৎপাদন ১১.৬০ লাখ মেট্রিক টন।
- উচ্চ ফলনশীল গমের জাত 'শতাব্দী'। হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৫৫ টন।
- বাংলাদেশের মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলায় সর্বাধিক গম উৎপাদিত হয়।

কৃষি সম্পদ

☑ **পাট:** বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট। পাট উষ্ণ অঞ্চলের ফসল। বায়ুর ৭০-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতার, চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাট বীজ বোনা হয়। পাটকে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ বলা হয়। পাট উৎপাদনে শীর্ষ দেশ ভারত। রপ্তানিতে শীর্ষদেশ বাংলাদেশ। ১৯৫১ সালে মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকায় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ৪৯টি পাটের জাত উদ্ভাবন করেছে। বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম প্রথম ২০১০ সালের জুন মাসে পাটের Genome Sequence বা জীবন রহস্য উন্মোচন করেন। দেশের উন্নতজাতের পাট হলো তোষা পাট এবং মেছতা পাট। পাটকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় ৬ মার্চ, ২০১৭। সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় ফরিদপুর জেলায়। ২০২২ – ২৩ অর্থ বছরে ৭.৫৪ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে।

কৃষি সম্পদ

- **চা:** বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল চা। এটি একটি ক্রান্তীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ। ১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম শহরের বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৫৪ সালে মতান্তরে ১৮৪৭ সালে সিলেটের মালনীছড়ায় বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। চা গবেষণা কেন্দ্র ও চা মিউজিয়াম মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত। চা বোর্ড অবস্থিত চট্টগ্রামে। চীন সর্বপ্রথম চা চাষ শুরু করে।
  - বাংলাদেশে বর্তমানে ১৬৭টি চা বাগান রয়েছে।
  - সবচেয়ে বেশি ৯১টি চা বাগান অবস্থিত মৌলভীবাজারে। এছাড়াও হবিগঞ্জ জেলায় ২৫টি, সিলেট জেলায় ১৯টি, চট্টগ্রাম জেলায় ২১টি, রাঙ্গামাটি জেলায় ২টি, পঞ্চগড় জেলায় ৮টি ও ঠাকুরগাঁও জেলায় ১টি চা বাগান আছে।
  - চা উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চীন এবং চা রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কেনিয়া।
  - দেশের প্রথম অর্গানিক চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০০ সালে পঞ্চগড় জেলায়।

❑ **ইক্ষু:** ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৩১ সালে পাবনার ঈশ্বরদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ৯ নভেম্বর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট। ইক্ষুর উন্নত জাতের মধ্যে ঈশ্বরদী-১/৫৩, ঈশ্বরদী- ২/৫৪, গেন্ডারিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

- উৎপাদনে শীর্ষ জেলা নাটোর।
- বর্তমানে বাংলাদেশে চিনির উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ টন।
- বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫টি চিনিকল আছে। এর মধ্যে ৯টি চালু আছে এবং ৬টির উৎপাদন বন্ধ আছে।

☑ **রেশম:** বাংলাদেশে রেশম গুটির চাষ হয় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে। রেশম চাষকে সেরিকালচার বলা হয়। রেশম পোকা মথ বা তুঁত গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে।

- রেশম উন্নয়ন বোর্ড রাজশাহীতে অবস্থিত।
- রেশমের ঐতিহ্যবাহী এবং অতি জনপ্রিয় শাড়ির নাম গরদ।
- রেশমের জন্য রাজশাহীকে সিল্ক সিটি বলা হয়।

কৃষি সম্পদ

তামাক: তামাক বাংলাদেশের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। তামাক গাছ লম্বায় ১২ থেকে ১৮ ইঞ্চি (৩-৬ ফুট) হয়। রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও বরিশাল জেলায় তামাক উৎপন্ন হয়ে থাকে।

- তামাক গবেষণা কেন্দ্র রংপুরে অবস্থিত।
- সুমাত্রা ও ম্যানিলা তামাকের উন্নত জাত।
- অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তামাক চাষ করা হয়।

জুম চাষ: জুম চাষ হলো পাহাড়ি এলাকায় এক ধরনের চাষাবাদ পদ্ধতি। পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে এক সাথে কয়েক প্রকারের ফসলের বীজ বপন করা হয়। এটাই জুম চাষ বা স্থানান্তরিত কৃষি পদ্ধতি। জুম চাষের বিকল্প পদ্ধতি হলো– সল্ট পদ্ধতি। Slash and Burn হলো জুম চাষের অন্য নাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯০% চাষীই জুমিয়া। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে জুম চাষ বেশি হয়। বছরে ২ বার জুম চাষ করা হয়। পাহাড়ের জঙ্গল কেটে, পুড়িয়ে জুম চাষ করা হয়। এই পদ্ধতি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

- জুম চাষের সাথে জড়িত জনগণ 'জুমিয়া' নামে পরিচিত।
- জুম পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসল হলো ধান, তুলা, তিল, আদা ও হলুদ।
- বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ হেক্টর ভূমি এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়।

বনজ সম্পদ

বাংলাদেশের বনভূমি

বাংলাদেশের বনভূমিকে প্রকৃতি অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- স্রোতজ ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন।
- সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বন বা ক্রান্তীয় চিরহরিৎ পাতা ঝরা বৃক্ষের বনভূমি।
- ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি।

➢ স্রোতজ ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবন

সুন্দরবনের অপর নাম বাদাবন, একে উপকূলীয় বনও বলা হয়। এর মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। যার মধ্যে ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার বা ২৪০০ বর্গ মাইল বাংলাদেশে অবস্থিত যা সুন্দরবনের ৬২ শতাংশের একটু বেশি। খুলনা, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাব্যাপী সুন্দরবন অঞ্চল। একক হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি সুন্দরবন এবং পৃথিবীর বৃহত্তম টাইডাল বন। এ বনের প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী, যার শ্বাসমূল রয়েছে। **এছাড়াও সুন্দরবনের পর্যটন কেন্দ্রসমূহ হলো :** কটকা, হিরণ পয়েন্ট, দুবলার চর, টাইগার পয়েন্ট ইত্যাদি। দুবলার চর মৎস্য আহরণ, শুটকি উৎপাদন ও উপকূলীয় বেষ্টনীর জন্য বিখ্যাত।

বনজ সম্পদ

সম্পদ: সুন্দরী, পেওয়া, কেওড়া, গরান, রাইন, ধুন্দল, আমুর, পাওর ইত্যাদি বৃক্ষ এ বনাঞ্চলের সম্পদ। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর গোলপাতাও (Nipa palm) জন্মে। সুন্দরী বৃক্ষ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকার কারণে এই বনভূমি সুন্দরবন নামে পরিচিত। এছাড়া এখান হতে মধু, মোম, শন ও ঔষধি গাছ সংগ্রহ করা হয়। বাঘ, বানর, হরিণ, কুমির ও বিভিন্ন প্রকার পাখিও বনাঞ্চলের অবদান। সুন্দরবনে দুই ধরনের হরিণ পাওয়া যায়। যথা: মায়া হরিণ ও চিত্রা হরিণ। আবার এ বনে তিন প্রজাতির কচ্ছপ পাওয়া যায়। যথা: কেটো কচ্ছপ, সুন্দি কচ্ছপ ও ধুম তরুণাস্থি কচ্ছপ। সুন্দরবন থেকে প্রচুর মধু সংগ্রহ করা হয়। স্থানীয় ভাবে পরিচিত মৌয়ালরা মধু সংগ্রহ করে।

সুন্দরবনের নদীসমূহ : পশুর, শিবসা, রায়মঙ্গল, বালেশ্বর প্রভৃতি সুন্দরবনের প্রধান নদী। পূর্বে বালেশ্বর নদী ও পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী অবস্থিত। এছাড়া হাড়িয়াভাঙা নদী সুন্দরবন অংশে বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্ত করেছে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব: বাংলাদেশের মোট কাঠের ৬০% সুন্দরবনের গাছ হতে সংগৃহীত হয়।

বনজ সম্পদ

নিচে সুন্দরবনের সম্পদের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব দেয়া হলো:

- ✓ দেশের বেশিরভাগ কাঠ সুন্দরবনের গাছ হতে পাওয়া যায়।
- ✓ সুন্দরবনের সুন্দরী বৃক্ষ গৃহ ও নৌকা নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিক ও টেলিফোন তারের খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এ বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত ধুন্দল বৃক্ষ পেন্সিল শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ গেওয়া বৃক্ষ নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এ বনভূমি হতে প্রাপ্ত মধু এবং বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষ ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এ বনাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার পশু-পাখি দেশের চিড়িয়াখানায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

বনজ সম্পদ

সুন্দরবনের বিভিন্ন গাছের কাজ

গাছের নাম	ব্যবহার
সুন্দরী	▪ হার্ডবোর্ড, আসবাবপত্র, ঘরের দরজা ইত্যাদি তৈরি হয়। ▪ সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এ কাঠ দিয়ে তৈরি নৌকার কদর রয়েছে।
গোলপাতা	▪ ঘরের ছাউনি তৈরিতে।
গরান	▪ ছোট নৌকার কাঠামো (পাজরা) তৈরিতে এই গাছের কাণ্ড ব্যবহার করা হয়। কাঠি, লাঠি, জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। ▪ গরানের কাঠ পুড়িয়ে ভালো মানের কয়লা তৈরি করা হয়।
ধুন্দল	▪ অপরিপক্ক ফল সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ থেকে ভোজ্যতেল বের করা যায়। ▪ পেন্সিল তৈরিতেও এ কাঠ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
গেওয়া	▪ দিয়াশলাইয়ের কাঠি তৈরিতে ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়। এ গাছের গুড়ি দিয়ে ঢোল, তবলা, খোল প্রভৃতি তৈরি হয়। ▪ খুলনার নিউজ প্রিন্ট মিলের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
কেওড়া	▪ বাংলাদেশে প্যানেল বানানো, প্যাক করার বাক্স তৈরি, আসবাবপত্র ও জ্বালানির জন্য কেওড়ার কাঠ ব্যবহৃত হয়।

বনজ সম্পদ

➢ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি

এ বনাঞ্চলের মূল বৈশিষ্ট্য হলো সমস্ত গাছের পাতা এক সাথে ঝরে না। ফলে বন সব সময় সবুজ থাকে। তাই একে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতা ঝরা বৃক্ষের বনভূমি বলে।

অবস্থান ও আয়তন: প্রায় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের কিয়দংশে এ বনভূমির বিস্তার। এ বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৯৪৭২ বর্গ কি.মি.। এটি বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনাঞ্চল।

বনজ সম্পদ: সেগুন, গর্জন, চাপালিশ, জারুল, পাম, চিকরাশি, বৈলাম, ময়না, পিটালী ইত্যাদি বৃক্ষ এ বনভূমিতে প্রচুর পাওয়া যায়। বাঁশ ও বেত এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়া বনাঞ্চলে নারকেল, জলপাই, কাঞ্চন, আমলকি ও বিভিন্ন ঔষধি গাছ জন্মে। বিভিন্ন প্রকার পশুর মধ্যে আছে হাতি, হরিণ, চিতা বাঘ ইত্যাদি।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

- ✓ এ অঞ্চলে প্রাপ্ত বাঁশ ও বেত দ্বারা সিলেট ও চট্টগ্রামে বাঁশ ও বেত শিল্প গড়ে উঠেছে।
- ✓ আসবাবপত্র, সেতু, রেলওয়ে স্লিপার প্রভৃতি নির্মাণের কাজে জারুল, চাপালিশ প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ ব্যবহৃত হয়।
- ✓ ময়না, পিটালী প্রভৃতি কাঠ দিয়াশলাই এবং প্লাইউড কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ এ বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত হরিণ, বাঘ, হাতি ইত্যাদির চামড়া, শিং, দাঁত নানা প্রকার কুটির শিল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়।

➢ ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি

এরূপ বনভূমির বৃক্ষের পাতা প্রয়োজনীয় উত্তাপ ও বৃষ্টির অভাবে ঝরে যায় বলে এরূপ বনভূমিকে পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বলে। স্থানভিত্তিতে এ বনাঞ্চলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

- ✓ **মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি:** এ বনভূমি ৪৪০ বর্গ কি.মি. আয়তনবিশিষ্ট। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় এ বনভূমি অবস্থিত।
  সম্পদ: শাল, গজারি, কড়াই, কাঁঠাল, নিম, ঝিকা, বাজনা, বনজাম ইত্যাদি বৃক্ষ পাওয়া যায়।
- ✓ **রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বনভূমি:** ৩৯ বর্গ কি. মি. আয়তনসম্পন্ন এ বনভূমি রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশে গড়ে উঠেছে।
  সম্পদ: এ বনভূমির প্রধান বৃক্ষ শাল।

ব্যবহার ও গুরুত্ব: এ বনাঞ্চলের বৃক্ষসমূহ মূলত ঘর-বাড়ি নির্মাণ ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও মৃত্তিকা বনজ সম্পদ বৃদ্ধির অনুকূলে। তারপরও আমাদের দেশে যে বনভূমি রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তথাপি বনভূমি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ফলে আমাদের বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশের প্রধান জলজ সম্পদ পানি ও মাছ। দেশের মোট জিডিপির ৩.৫৭% এবং কৃষিজ জিডিপির ২৬.৫০% মৎস্য খাত থেকে আসে। দেশে ২০২২ – ২৩ অর্থবছরে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ৪৭.৮১ লাখ মেট্রিক টন। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৪ হাজার ৪২ দশমিক ৬৭ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৫ হাজার ১৯১ দশমিক ৭৫ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ বেশি। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১% এর অধিক লোক মৎস্য আহরণের সাথে জড়িত। ফলে মৎস্য চাষ আমাদের দেশে রূপালি সম্পদ রূপে পরিগণিত।

➢ ইলিশ

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যের সাথে ইলিশ জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশে ইলিশ মাছ পণ্যের ওপর GI প্যাটেন্ট লাভ করেছে। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম। বিশ্বের মোট ইলিশের ৮৬% বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের মোট মৎস্য রপ্তানি আয়ের প্রায় ১২.১৫% আসে ইলিশ থেকে। চাঁদপুর জেলাকে ইলিশের বাড়ি বলা হয়। এ অঞ্চলের ইলিশ খেতে সবচেয়ে সুস্বাদু। তবে, বরিশাল বিভাগের ভোলা জেলায় সবচেয়ে বেশি ইলিশ ধরা পড়ে (৩.৩২ লাখ মেট্রিক টন) । দেশের জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১% এর বেশি।

ইলিশ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সরকারি পর্যায়ে বহুমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইলিশের প্রধান প্রজনন ঋতুতে প্রতিবছর ২২ দিন করে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের ইলিশের অভয়াশ্রম ৬টি। ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেন্টিমিটারের নিচের ইলিশকে জাটকা হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫.৬৭ লাখ মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদিত হয়। যা ২০১০-১১ অর্থবছরের চেয়ে ৬৬.৭৬% বেশি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

বিভিন্ন অর্থবছরে মৎস্য আহরণের পরিমাণ

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০১৮-১৯	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
অভ্যন্তরীণ জলাশয়	১৯.৫২	৩৭.২৪	৩৯.৪০	৪০.৫৩	৪০.৭৫
সামুদ্রিক	৪.৮৭	৬.৬০	৬.৮১	৭.০৬	৭.০৬
সর্বমোট	২৪.৩৯	৪৩.৮৪	৪৬.২১	৪৭.৫৯	৪৭.৮১

চিংড়ি

বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদকে White Gold বলা হয়। বাগদা চিংড়ির বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। সত্তর দশক থেকে বাগদা চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বাগদা চিংড়ি রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয় আশির দশক থেকে। বৃহত্তর খুলনা চিংড়ি চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে চিংড়ি মাছের চাষ। বাগদা চিংড়ি লোনা পানিতে চাষ করা হয় এবং গলদা চিংড়ি স্বাদু পানিতে চাষ করা হয়। বাগদা চিংড়ি 'ব্লাক টাইগার' নামে পরিচিত।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মৎস্য খাতের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- **মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন:** বর্তমানে মৎস্য চাষে মোট চাহিদার প্রায় শতভাগ পূরণ করছে হ্যাচারি উৎপাদিত রেণু/পোনা। তবে অন্তঃপ্রজনন সমস্যার কারণে হ্যাচারি থেকে গুণগত মানসম্পন্ন পোনাপ্রাপ্তি অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে পড়ে। এ সমস্যা দূর করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা প্রতিপালন করে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুডফিস উৎপাদন করে পোনার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১৪৩টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ১,১৯০টি খামার পরিচালিত হচ্ছে।

- **জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি:** বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের ১২.১৫ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ; বাংলাদেশ ইলিশ শীর্ষক ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে পরিচিত। সরকার এ সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

সরকার ইলিশ রক্ষা ও উন্নয়নে যে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হলো:

- জাটকা রক্ষায় নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের ভিজিএফ(Vulnerable Group Feeding) খাদ্য সহায়তা প্রদান।
- জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের জন্য উপকরণ সহায়তা বিতরণ।
- নির্বিচারে জাটকা নিধন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন।
- মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন প্রজনন এলাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন, পরিবহণ ও মজুদ বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন বাস্তবায়ন।
- প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন।
- পদ্মা, মেঘনার ঊর্ধ্বাঞ্চল ও নিম্ন অববাহিকায়, কালাবদর, আন্ধারমানিক ও তেঁতুলিয়াসহ অন্যান্য উপকূলীয় নদীতে মোট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ।
- জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

- **সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা:** সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের সুযোগকে সঠিকভাবে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করছে। সামুদ্রিক প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক উন্নয়নের কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায়। সম্পদের সুষ্ঠুব্যবস্থাপনা, আহরণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) বিকাশ সাধনে 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০' গত ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখ সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা' ও 'সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা-২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর. ভি মীন সন্ধানী' এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৪৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে একটি সামুদ্রিক সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট পরিচালিত হচ্ছে এবং সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প-এর আওতায় আরও ১৬টি সামুদ্রিক সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট নির্মাণ করা হবে। ৬৯৮ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা মেরিন রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ইকোফিশ প্রকল্পের সহায়তায় হাতিয়া উপজেলাধীন নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় ৩,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা MPA (Marine Protected Area) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কক্সবাজারের কলাতলীতে কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলা, টেকনাফ, মহেশখালী ও উখিয়া উপজেলার ০.৮ হেক্টর উপকূলীয় এলাকায় সি-উইড ও ওয়েস্টার কালচার পাইলটিং করা হচ্ছে। এর ফলে সমুদ্র অর্থনীতিতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি: মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, চীনসহ বিশ্বের ৫০ টিরও অধিক দেশে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। তন্মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের প্রধান বাজার। বর্তমানে মোট ১০৫টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা লাইসেন্সভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৭৩টি EU ভুক্ত দেশসমূহে মৎস্য রপ্তানি করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৪ হাজার ৪২ দশমিক ৬৭ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৫ হাজার ১৯১ দশমিক ৭৫ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারী পর্যন্ত ৪৩,১১৭.৪৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে ৩২২৬.০৩ কোটি টাকা।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

প্রাণিসম্পদ

বাংলাদেশের কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত প্রাণিসম্পদ। গোরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি এদেশের প্রাণিসম্পদের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামীণ পরিবহণ, আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে এর অবদান ছিল শতকরা ১.৬৬ ভাগ। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের মোট জিডিপির ১.৯০ শতাংশ প্রাণী সম্পদ থেকে আসে। গবাদি পশু উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১২তম। বাংলাদেশ থেকে মাংস ও পশুপণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে।

বিভিন্ন অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
দুধ (লক্ষ মে. টন)	১১৯.৮৫	১৩০.৭৪	৯৫.৬৮
মাংস (লক্ষ মে. টন)	৮৪.৪০	৯২.৬৫	৬৬.৭০
ডিম (কোটি)	২০৫৭.৬৪	২৩৩৫.৩৫	১৬২৭.৮৯

[তথ্যসূত্র : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত]

বাংলাদেশ ও পর্যটন

১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পর্যটন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত করায় আস্তে আস্তে পর্যটন শিল্প বিকশিত হতে শুরু করে। বিশ্বের ১৮৪টি পর্যটন সমৃদ্ধ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৬০তম, কিন্তু ১০ বছর পর তা ১৮তম তে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে পর্যটন খাতে সরাসরি ১৫ লাখ মানুষ ও পরোক্ষভাবে ২৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪০ লাখ, যার আর্থিক মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০০ কোটি টাকা।
২০১৯ সালে GDP তে পর্যটন খাতের অবদান ৪.১%, যার অর্থমূল্য ৭৭,৩০০ কোটি টাকা। ২০২৩ সালে তা হবে ৬.৮% এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ৫১টি দেশের পর্যটকরা বাংলাদেশ আসবে এবং GDP তে অবদান দাঁড়াবে ১০%। ২০২৪ সাল নাগাদ মোট কর্মসংস্থানের ১.৯% পর্যটন শিল্পের অবদান। তাছাড়া এ শিল্পের মাধ্যমে GDP-তে মূল্য সংযোজন হয় প্রায় ১৬,৪০০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের পর্যটন স্থানসমূহ

পর্যটন পুলিশের মতে, দেশে প্রায় ৮ শতাধিক পর্যটন এলাকা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– সুন্দরবন, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদ ও সাজেক ভ্যালি, খাগড়াছড়ির আলুটিলা, বান্দরবানের নীলগিরি, নীলাচল, বগালেক, রেমাক্রি, নাফাখুম, ক্রেওক্রাডং ও তাজিংডং, ঢাকার লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, কুমিল্লার ময়নামতি ও শালবন বিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড়, সিলেটের জাফলং ও বিছানাকান্দি ইত্যাদি।

বাংলাদেশের জন্য ৫ম, অস্ট্রেলিয়া

আফ্রিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় জন্য

ইন্দোনেশিয়া । মালয়েশিয়া

বাংলাদেশ ২০ তম Bd ; [illegible]

নির্দিষ্ট দেশসমূহ

২০২৬ পর্যটন খাতে GDP

পর্যটন

পর্যটন খাতে সমস্যাসমূহ

- ✓ প্রচারের অভাব
- ✓ অবকাঠামোর উন্নতি কম
- ✓ নিরাপত্তাজনিত সমস্যা
- ✓ উন্নত সেবা ও তথ্যের অভাব
- ✓ পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাব
- ✓ সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের অভাব

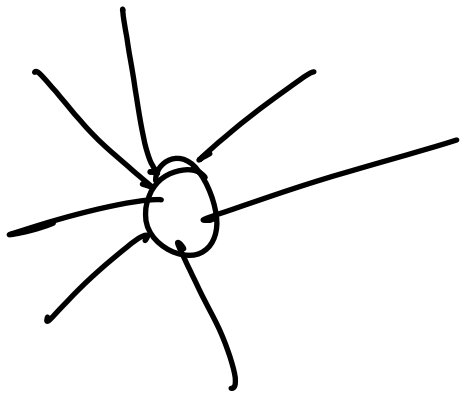

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপ

- ✓ বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন – ২০১০ ও জাতীয় পর্যটন নীতিমালা – ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে ।
- ✓ ২০১৫ সালে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।
- ✓ উক্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দের চিত্র :

  অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন : প্রায় ২০০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে দোহাজারী রামু ঘুমধুম পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ, সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, নাফ ট্যুরিজম পার্ক ও সোনাদিয়া ইকোট্যুরিজম পার্ক ইত্যাদি নির্মাণ করছে।

পর্যটন

বেসামরিক বিমান ও পর্যটন খাতে বাজেট বরাদ্দের চিত্র (কোটি টাকায়)

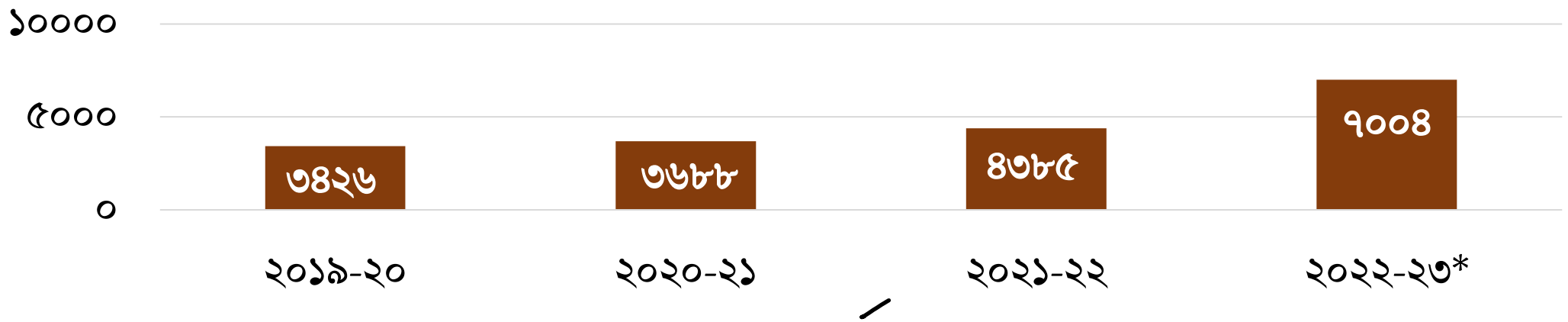

➢ পর্যটনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তিন ধাপের এ মহাপরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে –

১ম ধাপ : অবকাঠামো উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানের বিনোদন ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

২য় ধাপ : পর্যটকদের সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

৩য় ধাপ : ট্রাভেল এজেন্ট, কার রেন্টাল ফার্ম, হস্তশিল্প ও কৃষিপণ্যের বিক্রির বিকাশ ঘটানোর বিষয়।

খনিজ সম্পদ

❑ বাংলাদেশের প্রাপ্ত খনিজ সম্পদগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

১ শক্তিসম্পদ

২ ধাতব খনিজ

৩ অধাতব খনিজ

খনিজ সম্পদ

শক্তিসম্পদ

(i) প্রাকৃতিক গ্যাস (ii) কয়লা (iii) খনিজ তেল

প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের প্রধান খনিজ সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ পূরণ করে। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন (CH_4), যার পরিমাণ ৮০-৯০ শতাংশ। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৮টি। পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৩৯.৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ২৮.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৯.১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে ২০২৩ সময়ে উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ ৮.৬৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে মোট গ্রাহক সংখ্যা ৪৩ লাখ।

খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার (২০২১-২২)

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	গ্যাস ব্যবহারের হার
১	বিদ্যুৎ	৪০%
২	শিল্প	১৯%
৩	ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৭%
৪	গৃহস্থালি	১৩%
৫	সার কারখানা	৬%
৬	সিএনজি	৪%

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা – ২০২৩]

২০২১-২২ অর্থবছরে দেশজ গ্যাস উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৮৪৪.১১ বিলিয়ন ঘনফুট এবং আমদানিকৃত এলএনজি (আরএলএনজি) সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ১০৮০.৪ বিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ মোট প্রায় ১০০১.৪ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে।

খনিজ সম্পদ

কয়লা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৭,৮২৩ মিলিয়ন টন, যা প্রায় ১৮৫ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাস সমতুল্য। মজুদকৃত কয়লা থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত উত্তোলিত মোট কয়লার পরিমাণ ১৩.৪৭ মিলিয়ন টন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার রয়েছে। বর্তমানে প্রতিবছর ০.৮ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র থেকে ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। উত্তোলিত কয়লা ব্যবহার করে খনি এলাকায় অবস্থিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হতে ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও, বর্তমানে অনুসন্ধান চালিয়ে কয়েকটি স্থানে লিগনাইট ও বিটুমিনাস শ্রেণির কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এগুলো থেকে এখনও উত্তোলন শুরু হয়নি।

খনিজ সম্পদ

প্রাপ্তিস্থান: রংপুরের খালাসপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, দীঘিপাড়া, জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, সিলেটের লালঘাট, টাকেরহাট, ভাঙ্গারঘাট প্রভৃতি। ফরিদপুরের বাগিয়া ও চান্দাবিল, খুলনার কোলাবিল ও সিলেটে কিছু পীট কয়লা পাওয়া গিয়েছে।

কয়লার ক্ষেত্র	সঞ্চিতির পরিমাণ
১. বড়পুকুরিয়া	৪১০ মিলিয়ন মে.টন
২. দীঘিপাড়া	৭০৬ মিলিয়ন মে.টন
৩. ফুলবাড়ি	৫৭২ মিলিয়ন মে.টন
৪. খালাসপীর	৬৮৫ মিলিয়ন মে.টন
৫. জামালগঞ্জ	৫৪৫০ মিলিয়ন মে.টন
মোট	৭৮২৩ মিলিয়ন মে.টন

[উৎস: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ]

বিদ্যুৎ সম্পদ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৬৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৬০৯ কিলোওয়াট ঘণ্টা। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৬.২৯ লক্ষ কিলোমিটারে এবং গ্রাহক সংখ্যা ৪.৪৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিস্টেম লস ৯.৩০ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ১৪.৭৩ শতাংশ। বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে উৎসাহ ও প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ।

মুজিববর্ষে সরকার দেশের সকল নাগরিককে ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এনেছে। তারপরও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম সরকার অব্যাহত রেখেছে। সরকারের ভিশন ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

Written

2020 – Vision

↓

2030 → SDG

↓

2080 →

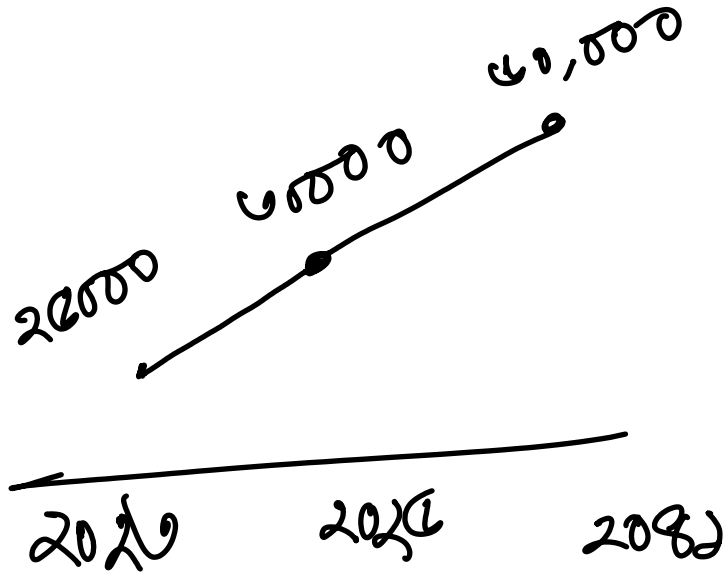

বিদ্যুৎ সম্পদ

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

২০১০-১১ অর্থবছরে সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ১৫০ বিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ২১৯ বিলিয়ন ঘনফুট এ দাঁড়িয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জ্বালানি হিসেবে প্রথম কয়লা ব্যবহার করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার দাঁড়ায় ২.২৪ মিলিয়ন টন। ২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৪৪ ও ১৮৭ মিলিয়ন লিটার।

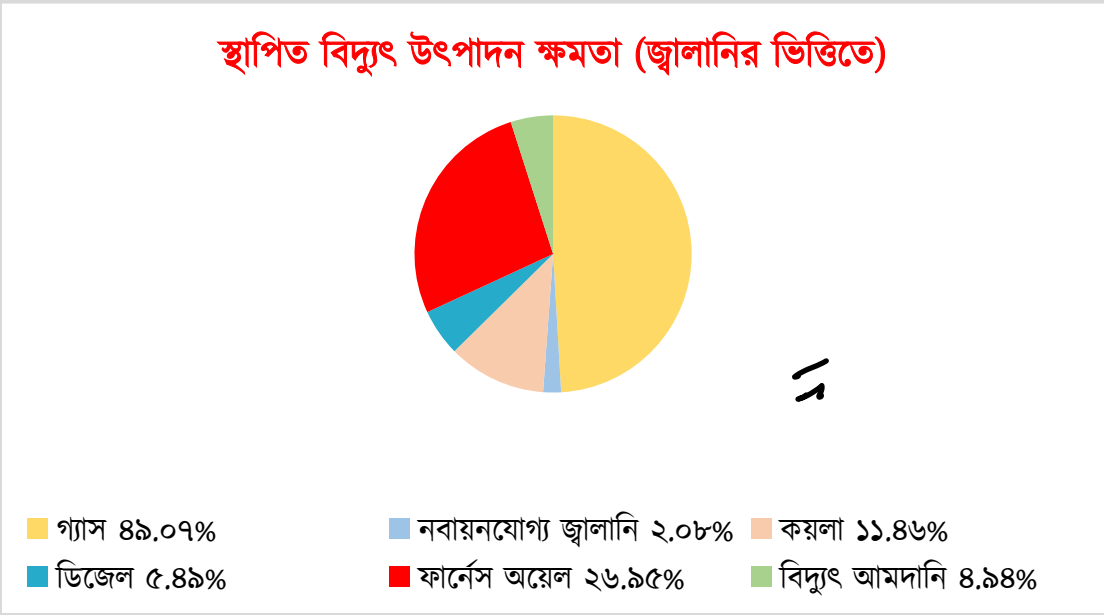

মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩,৪৮২ মেঃ ওঃ

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ, জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত*

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো প্রকল্প নির্মাণাধীন আছে। সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হলো –

- ✓ আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট (গ্যাস)
- ✓ ঘোড়াশাল ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট রিপাওয়ারিং
- ✓ খুলনা ৩৩৬ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- ✓ বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- ✓ মাতারবাড়ী ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক
- ✓ রূপসা ৮৮০ মেগাওয়াট সিসিপিপি

বিদ্যুৎ সম্পদ

বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকৃতি	প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র	অবস্থান
পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ঈশ্বরদী, পাবনা
সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র	নরসিংদী সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র	করিমপুর ও নজরপুর, নরসিংদী
গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র	হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সিলেট
কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র / তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বড় পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বড় পুকুরিয়া, দিনাজপুর
বায়ু বিদ্যুৎ	বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প	সোনাগাজী, ফেনী

সমুদ্র অর্থনীতি (BLUE ECONOMY)

'ব্লু-ইকোনমি' বা 'সমুদ্র অর্থনীতি' ধারণাটির জনক গুন্টার পাওলি। ২০১০ সালে তাঁর প্রকাশিত "The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations; 1000 Million Jobs" বইটিতে প্রথম সমুদ্র অর্থনীতি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। তবে ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত 'Rio+20' বা 'Earth Summit-2012' তে 'ব্লু-ইকোনমি' ধারণাটির প্রসার ঘটে।

সমুদ্র অর্থনীতির বৈশ্বিক অবদান

- বিশ্বের আমদানি রপ্তানির ৮০% হয় সমুদ্রপথে।
- বৈশ্বিক জিডিপিতে অবদান প্রায় ৭০ ট্রিলিয়ন ডলার।
- পর্যটন শিল্পের ৭০% সমুদ্র কেন্দ্রিক। প্রতি বছর সমুদ্রে পর্যটন হতে আয় ২০০ বিলিয়ন ডলার।
- বিশ্বের গ্যাসের ৩০% যোগান দেয় সমুদ্র।
- খাদ্য হিসেবে মৎসের ৪০% যোগান দেয়, যার অর্থমূল্য ৩৫ বিলিয়ন ডলার এবং যা বিশ্বের মোট আমিষের ২০%।

সমুদ্র অর্থনীতি (BLUE ECONOMY)

সমুদ্র অর্থনীতি ও বাংলাদেশ

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অংশে রয়েছে ৭১৬ কি.মি তটরেখা এবং উপকূল থেকে প্রায় দেশের স্থলভাগের সমান ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি সমুদ্র অঞ্চল। এছাড়াও রয়েছে ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌমত্ব।

এই নীল জলরাশির মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিচিত্র সামুদ্রিক সম্পদ। যথা: তেল, গ্যাস, মূল্যবান বালু, ইউরেনিয়াম, মোনাজাইট, জিরকন, শামুক, ঝিনুক, মাছ, অক্টোপাস, হাঙর ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদ রয়েছে।

মিয়ানমার ও ভারত থেকে সমুদ্র বিজয়ের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য আহরণ, খনিজ সম্পদ, পর্যটনসহ নানান কারণে সমুদ্র হয়ে উঠেছে জিডিপির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত।

Blue Economy

- রাজনৈতিক E
- অর্থনৈতিক
- সামাজিক

সমুদ্র অর্থনীতি (BLUE ECONOMY)

নিম্নে সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

- **মৎস্য সম্পদ আহরণ:** বঙ্গোপসাগর হলো মৎস্য সম্পদের বিশাল ভান্ডার। এখানে প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ রয়েছে। আরও রয়েছে ২০ প্রজাতির কাঁকড়া ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৩০০ প্রজাতির শামুক ও ঝিনুক। সেভ আওয়ার সি এর তথ্যমতে, সমুদ্র থেকে শুধু মাছ রপ্তানি করে বিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব। আবার জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর মতে, ২০২২ সালের মধ্যে যে চারটি দেশ মৎস্য সম্পদে বিপুল পরিমাণ সাফল্য অর্জন করার কথা ছিল, তার মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। ২০২০-২১ অর্থবছরে সারা দেশে উৎপাদিত ৪৬.২১ লাখ মেট্রিক টন মাছের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ ছিল ৬.৮১ লাখ মেট্রিক টন। এছাড়াও দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১১% মানুষ মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

- **খনিজ সম্পদ:** বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার ২৬টি ব্লকের ১০ ও ১১ নম্বরে কাজ করছে তেল গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানি কনোকো ফিলিপস। কনোকো ফিলিপস জানায় সেখানে প্রায় ৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ আছে। শুধু গ্যাসই নয় বঙ্গোপসাগরে ১৩ রকমের ভারী খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। যার মধ্যে রয়েছে ইলমেনাইট, রুটাইল, জিরকন, কোবাল্ট ইত্যাদি।

সমুদ্র অর্থনীতি (BLUE ECONOMY)

- **পর্যটন শিল্প:** বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪ লক্ষ বিদেশি পর্যটক ও ৯০-৯৫ লক্ষ অভ্যন্তরীণ পর্যটক আসে। এ খাতে প্রত্যক্ষভাবে ১৫ লাখ ও পরোক্ষভাবে মিলিয়ে মোট ৪০ লাখ মানুষ কাজ করছে। ২০১৯ সালে GDP-তে এ খাতের অবদান ৪.১% ছিল। (সূত্র: WTTC)।

- **ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব:** সমুদ্র বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, "বঙ্গোপসাগর যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, দক্ষিণ এশিয়া তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।" এ জন্য পরাশক্তিগুলো বঙ্গোপসাগর দখলে রাখতে নানা পরিকল্পনা করছে।

- **সমুদ্র পরিবহণ:** বিশ্ব বাণিজ্যে পণ্য পরিবহণের প্রায় ৯০ শতাংশ হয়ে থাকে সমুদ্র পথে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর দিয়ে প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় ২৬০০ জাহাজের মাধ্যমে ৩০-৪০ বিলিয়ন ডলারের আমদানি রপ্তানি হয়ে থাকে। এসব পণ্যে জাহাজ ভাড়াই প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার হয়ে থাকে।

- **জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ ভাঙা:** পূর্বে দেশে প্রধানত জাহাজ ভাঙার শিল্প প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে এর সাথে নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পও গড়ে উঠেছে।

সমুদ্র অর্থনীতি (BLUE ECONOMY)

- **নবায়নযোগ্য জ্বালানি:** সমুদ্রের ঢেউ নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস। সমুদ্রের ঢেউ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় এবং সরকার এ ধরনের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে।
- **লবণ তৈরির উৎস:** লবণের প্রধান উৎস সমুদ্র। সমুদ্র উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর একটি প্রধান অংশ লবণ শিল্পের সাথে জড়িত।
- **ড্রাগ তৈরির উপকরণ:** সমুদ্র হতে ঔষধ তৈরির বিভিন্ন উপকরণ পাওয়া যায়।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- ✓ সমুদ্র অঞ্চলে সার্বভৌমত্ব অর্জন।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও কার্বন নিঃসরণ কমানো।
- ✓ সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি।
- ✓ সমুদ্রকে দূষণমুক্ত রাখা। ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নে সরকারের পদক্ষেপ।
- ✓ জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইন্সটিটিউট গঠন করা হচ্ছে।
- ✓ পায়রা সমুদ্র বন্দর ও মাতারিবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ।
- ✓ মেরিন ড্রাইভ ও ট্যুরিজম পার্ক গঠন।
- ✓ উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা।

উপরের আলোচনা দেখে সহজেই অনুমেয় যে সমুদ্র অর্থনীতি আগামী দিনের ভূ-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। এ কারণেই সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ‘সুনীল অর্থনীতি’ কী? [৪৪তম বিসিএস]
- সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কীভাবে অবদান রাখতে পারে তা আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- সামুদ্রিক সম্পদ আহরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বর্ণনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের বনভূমি ও বনজ সম্পদ রক্ষা করার গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বিশ্লেষণপূর্বক আপনার পরামর্শ ব্যক্ত করুন। [৪১তম বিসিএস]
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপর যে সকল বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের বিবরণ দিন। [৩৭তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় দ্বারা আপনি কী বুঝেন? [৩৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি চিত্র তুলে ধরুন। [৩৫তম বিসিএস]
- ভবিষ্যতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জলবায়ুর ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে। [৩৫তম বিসিএস]
- সমুদ্রজল স্ফীতিজনিত কারণে বাংলাদেশের কী বিপদ ঘটতে পারে? [৩৪তম বিসিএস]
- বৃষ্টিপাত হ্রাসজনিত কারণে বাংলাদেশে এর কী প্রভাব পড়তে পারে? [৩৪তম বিসিএস]
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা কী? [৩৪তম বিসিএস]
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে কী কী বিরূপ প্রভাব পড়েছে এবং পড়তে পারে বর্ণনা করে সরকারের গৃহীত প্রস্তাবমূলক ব্যবস্থার বর্ণনা দিন। [৩২তম বিসিএস]
- বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা বর্ণনা করুন। বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? এই ক্ষতি মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কী কী? [৩০তম বিসিএস]

৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ১৪

টপিক:

- ✓ বাণিজ্য এবং বিশ্বায়ন, টেকসই উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ।
- ✓ বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জেন্ডার ইস্যু ও উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি করে থাকে। ফলে বাণিজ্যিক ভারসাম্যে বাংলাদেশ সাধারণত ঘাটতিতে থাকে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য হলো- তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, কাঁচা পাট, চা, চামড়া ইত্যাদি। অন্যদিকে বাংলাদেশের আমদানিকৃত পণ্য হচ্ছে মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, ভোজ্য তেল, পরিবহণ সামগ্রীসহ নানান ভারী শিল্পের যন্ত্রপাতিসমূহ।

বাংলাদেশের বাণিজ্যে [এফওবি (ইপিজেডসহ)] ভারসাম্য (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	আমদানি	রপ্তানি	বাণিজ্য ভারসাম্য
২০১৯-২০	৫০.৬৯	৩২.১২	– ১৮.৫৭
২০২০-২১	৬০.৬৮	৩৬.৯০	– ২৩.৭৮
২০২১-২২	৫৪.৩৮	৩২.০৭	– ২২.৪৩

২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৩৭.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্বের অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ৯.৫৬ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি আয় ৫৪.২ বিলিয়ন হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ৫২.৭১ বিলিয়ন মাকিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০.৩১ শতাংশ কম। চলতি অর্থবছর শেষে আমদানি ব্যয় ৭৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

1.

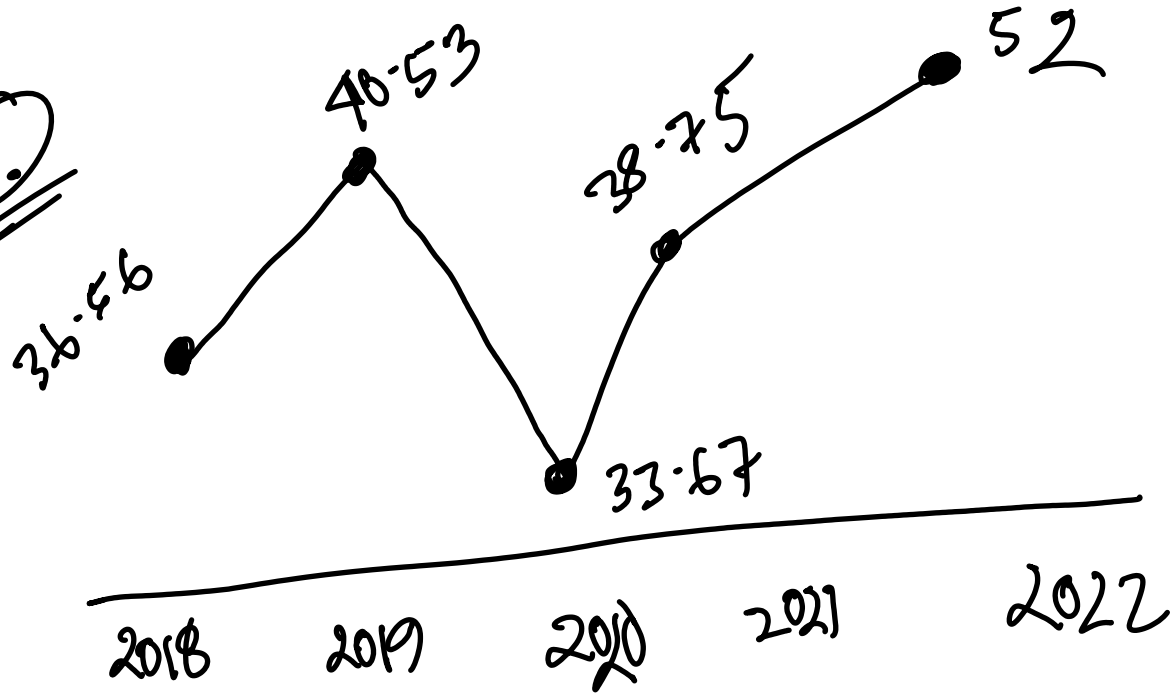
36·66
40·53
33·67
38·75
52
2018
2019
2020
2021
2022

2.

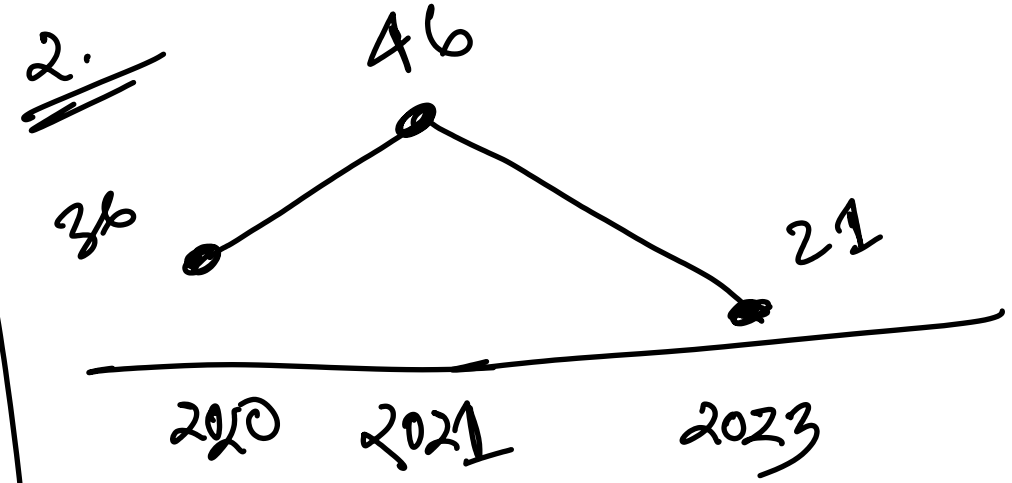
36
46
21
2020
2021
2023

3)

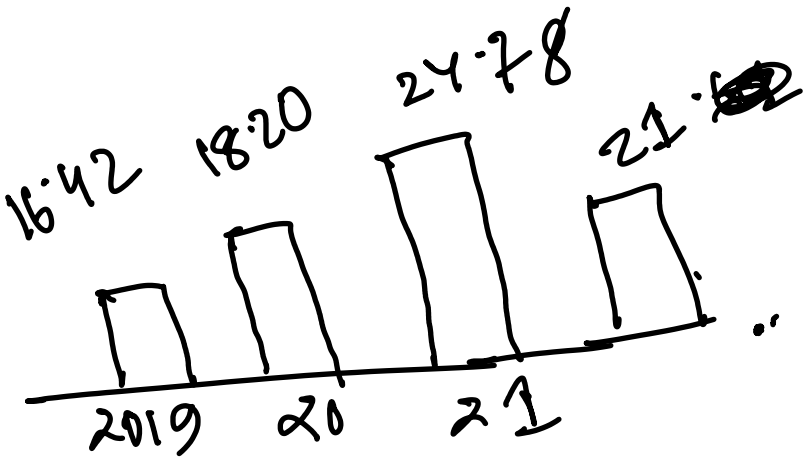
16·42
18·20
24·78
2019
20
21

OB

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

আমদানি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুসারে, ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৮৯.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি খাতে খরচ করেছিল যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪৪.২৪ গুন বেশি। টাকার হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি টাকার পণ্য আমদানি করে চীন থেকে। কিন্তু পণ্যের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় ভারত থেকে।

আমদানির চিত্র

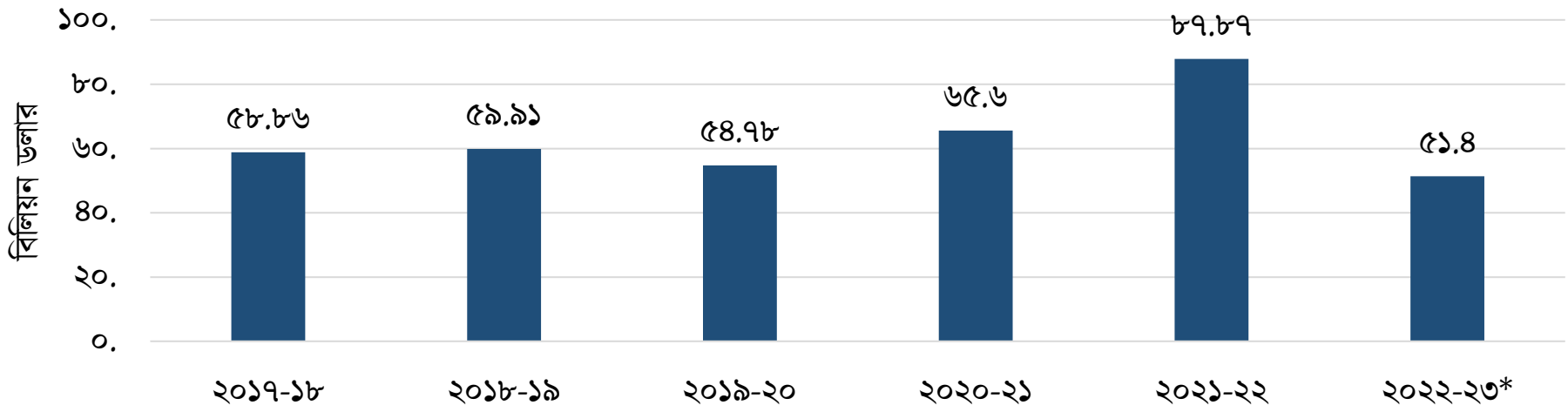

** এপ্রিল – ২০২৩ পর্যন্ত*

[তথ্যসূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা – ২০২২]

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

আমদানির বৈশিষ্ট্য

- ✓ বাংলাদেশ প্রধানত আমদানি নির্ভর দেশ। মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ নানান ভারী শিল্প আমদানি করে।
- ✓ মোট আমদানির বেশির ভাগই চীন ও ভারত নির্ভর।
- ✓ বেশির ভাগ আমদানি দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা ১ এর চেয়ে কম। তাই আমদানি দ্রব্য নিয়ে দর কষাকষির ক্ষমতা কম।
- ✓ GDP থেকে আমদানি বাবদ ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ বেশি।

রপ্তানি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুসারে, বাংলাদেশ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫২.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি বাবদ আয় করেছিল। বিশ্বে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বর্তমানে ৪২তম। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি টাকার পণ্য রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে, দ্বিতীয় অবস্থানে আছে জার্মানি। বাংলাদেশ মোট ১৭৩টি দেশে নানা ধরনের পণ্য রপ্তানি করে। এদের মধ্যে কৃষিপণ্য রপ্তানি করে ১২১টি দেশে। আবার, বাংলাদেশ রপ্তানি করে এমন ১০টি শীর্ষ দেশের মধ্যে ইউরোপীয়ান দেশই রয়েছে ৯টি।

পণ্য হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তৈরি পোশাক (RMG) রপ্তানি করে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে পাট ও পাটজাত দ্রব্য। সারাবিশ্বে কাঁচাপাট রপ্তানিতে বাংলাদেশ শীর্ষে। রপ্তানিমুখী শিল্পে করোনার ক্ষতি কাটাতে সরকার সহজ শর্তে প্রায় সাড়ে দশ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এ ঋণ পরিশোধের সময় ৫ বছর।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

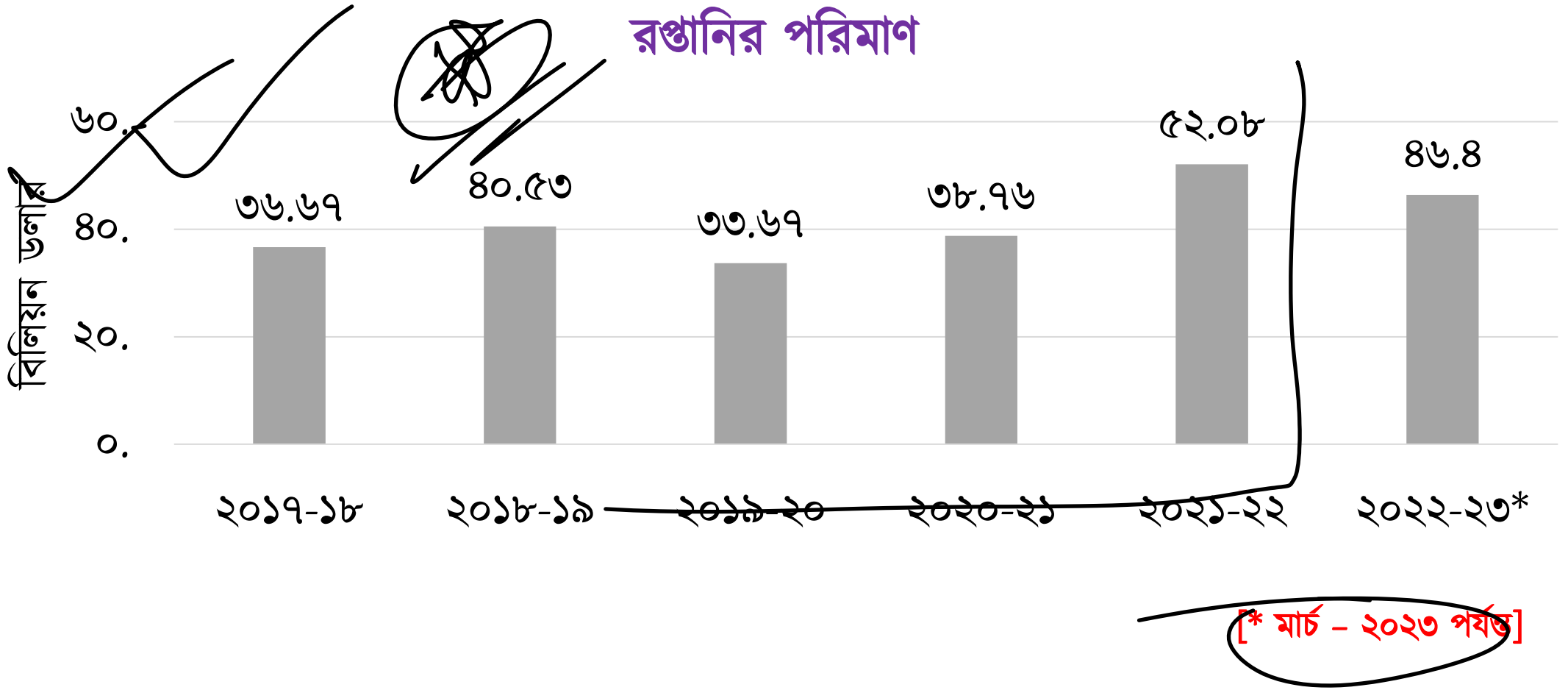

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

❖ **পণ্য রপ্তানি ২০২২-২৩:** ৩ জুলাই, ২০২৩ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB) সদ্য সমাপ্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের পণ্য রপ্তানির প্রাথমিক তথ্য প্রকাশ করে। সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে ৫৫,৫৫৬.৭৭ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এ রপ্তানি দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর মধ্যে সাড়ে ৮৪% এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে।

বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি আয় (২০২২-২৩)

অবস্থান	পণ্যের নাম	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)
১ম	তৈরি পোশাক	৪৬,৯৯১.৬১
	নিটওয়্যার	২৫,৭৩৮.২০
	ওভেন গার্মেন্টস	২১,২৫৩.৪১
২য়	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	১,২২৩.৬২
৩য়	হোম টেক্সটাইল	১,০৯৫.২৯
৪র্থ	পাট ও পাটজাত পণ্য	৯১২.২৫
৫ম	কৃষিজাত দ্রব্য	৮৪৩.০৩

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

রপ্তানি বাণিজ্যে সমস্যা

✓ সুষ্ঠু রপ্তানি নীতির অভাব।	✓ সুষ্ঠু বাণিজ্যে চুক্তির অভাব।	✓ মূলধনের স্বল্পতা।
✓ কম সংখ্যক রপ্তানি পণ্য।	✓ নিম্নমানের পণ্য।	✓ অধিক পরিমাণে রপ্তানি শুল্ক ও বাধা আরোপ।
✓ রপ্তানি পণ্যের বাজার সীমিত।		

সুপারিশসমূহ

- রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করে রপ্তানি পণ্যে বহুমুখীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পুনর্গঠন করা।
- **শুল্ক রেয়াত:** রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহ দানের জন্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির উপর আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামালের উপর হতে আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। এটিই শুল্ক রেয়াত।
- বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
- রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা দেওয়া।
- পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

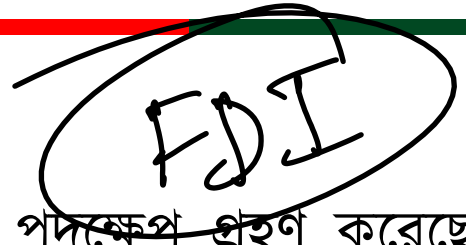

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ

বাংলাদেশ বৈদেশিক বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণের জন্য নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর প্রভাব স্বরূপ অনেক দেশ বাংলাদেশকে Emerging tiger বা 'উদীয়মান বাঘ' বলে থাকে। World Bank ও IFC কর্তৃক প্রকাশিত Ease of Doing Business: Global Rank- এ ২০২২ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৬৮তম, যা ২০১৯-এ ছিল ১৭৬তম। এছাড়া ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৯তম। এছাড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান Goldman Sachs বাংলাদেশকে "Next-11" বলে আখ্যায়িত করেছে। তাই বর্তমানে বাংলাদেশ বিনিয়োগের সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে চীন ও সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হয় বিদ্যুৎ খাতে। ২০২২ সালের World Investment Report অনুসারে FDI আকর্ষণে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ

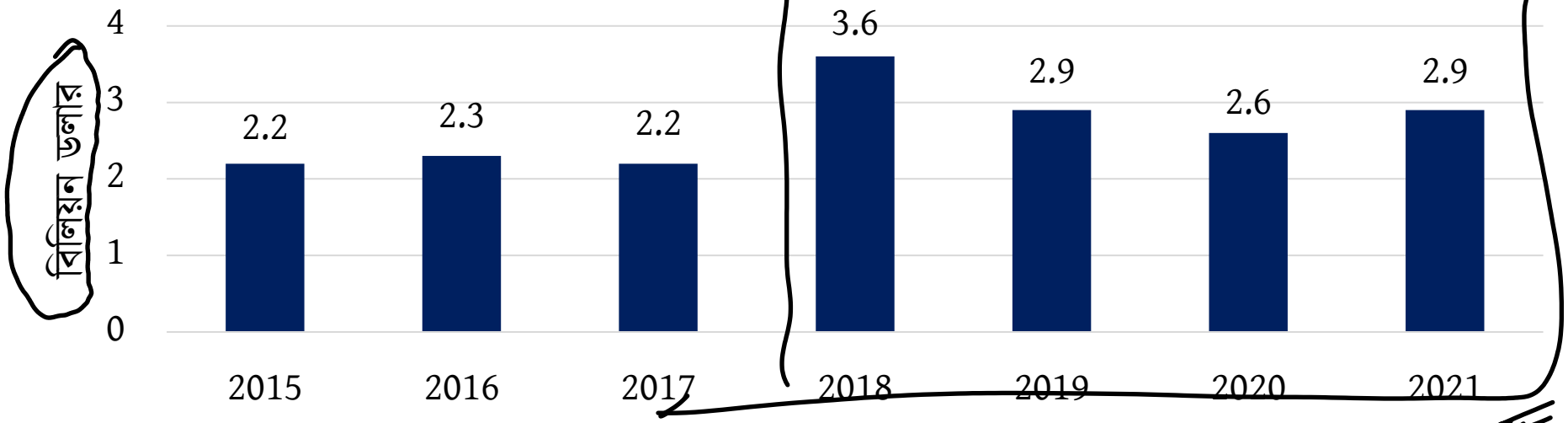

[তথ্যসূত্র : World Investment Report – 2022]

সবচেয়ে বেশি FDI করে	যে খাতে সবচেয়ে বেশি
১. নেদারল্যান্ডস	১. বিদ্যুৎ
২. USA	২. বস্ত্র
৩. চীন	

বৈদেশিক বিনিয়োগ

সমস্যা

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ তুলনামূলক কম হলেও ২০১৮ সালে রেকর্ড পরিমাণ ৩.৬ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ পায় বাংলাদেশ। কিন্তু করোনা মহামারির প্রভাবে এ বিনিয়োগ প্রবাহ হ্রাস পায়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ:

✓ যথাযথ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন হয়নি। ✓ বিনিয়োগে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা নানান বিধি-নিষেধের জালে আটকা থাকতে হয়। ✓ যথাযথ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়নি। ✓ বিদেশিদের কাছে বাংলাদেশের নেতিবাচক ইমেজ।	✓ পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাব রয়েছে। ✓ প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা। ✓ প্রচারের অভাব।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

FDI/বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সরকারের পদক্ষেপ

- **BIDA গঠন ও পরিচালনা :** ২০১৬ সালে সরকার বিডা গঠন করে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিডা দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় ২৫০০০ উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।
- **One Stop Service প্রদান :** One Stop Service এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আইন পাশ হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) সেবা প্রদান শুরু করে বিডা। যার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। বর্তমানে ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের ১৫৪টি সেবা পর্যায়ক্রমে বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে বিডা এবং ১৬টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- **Ease of Doing Business উন্নতি :** World Bank কর্তৃক প্রকাশিত Ease of Doing Business -এ বাংলাদেশ প্রতিবছরই উন্নতি করছে।
- **BEPZA ও BEZA-র মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন :** সরকার বেপজার মাধ্যমে ইপিজেডসমূহের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে এবং বেজা-এর মাধ্যমে SEZ (Special Economic Zone) গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

- **বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অবাধ সরবরাহ :** ইপিজেড ও অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সুবিধা দিতে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও গ্যাস আমদানির উপর মনোযোগ দিয়েছে।

- **যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উন্নত অবকাঠামো তৈরি :** যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার মেগাপ্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও আইটি পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করছে।

- **SEZ গঠন:** সরকার সারাদেশে ১০০টি SEZ গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার মধ্যে ৯৩টি অনুমোদন পেয়েছে। ইতোমধ্যে ২৮টিরও বেশি কাজ চলমান আছে।

- **ট্যাক্স হলিডে :** সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে SEZ সমূহে ১০ বছর মেয়াদী ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করেছেন।

বিশ্বায়ন (GLOBALIZATION)

ইংরেজি 'Globe' থেকে Globalization শব্দটি এসেছে, যার অর্থ বিশ্বায়ন। এটা একটা প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া গোটা বিশ্বকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। জাতিরাষ্ট্রের সীমানাকে তুলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে একটি গ্রামে পরিণত করেছে। বিশ্বায়ন হলো বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। বাণিজ্যকে বাধাহীনভাবে বিশ্বব্যাপী পরিচালনা করার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালাই হলো বিশ্বায়ন। আবার বিশ্বায়ন বলতে সারা বিশ্বে পণ্য ও পুঁজির অবাধ প্রবাহকে বোঝায়।

পুঁজিসহ উৎপাদনের সকল উপকরণ আন্তর্জাতিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের দ্বারা একটি বিশ্বগ্রাম (Global Village) প্রতিষ্ঠা করাকে বিশ্বায়ন বলা যায়। এর ফলে, নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সীমানার বিলুপ্তি ঘটে, বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়, বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে অর্থ ও সম্পদের অবাধ প্রবাহ ঘটে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে জেনেভায় শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বহুজাতিক সাধারণ চুক্তি (General Agreement on Tariffs and Trade or GATT) সম্পাদনের সাথে সাথে বিশ্বায়ন ধারণার সূত্রপাত হলেও নব্বই দশকের শেষদিকে এর সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে। বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো –

✓ পণ্য ও শ্রমের অবাধ প্রবাহ	✓ বাজার উন্মুক্তকরণ	✓ তথ্যের অবাধ প্রবাহ	✓ পুঁজির অবাধ প্রবাহ

বাংলাদেশের উপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীর কোন দেশই আর একাকি চলতে পারে না। প্রতিটি রাষ্ট্রই বিভিন্ন ব্যাপারে অন্য রাষ্ট্রসমূহের উপর নির্ভরশীল। তাই পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে অস্থিরতা শুরু হলে পুরো পৃথিবীতেই তার প্রভাব দেখা যায়। আর যদি বৃহৎ উৎপাদনশীল রাষ্ট্রসমূহ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তখন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরেই তার নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশেও দেখা দিচ্ছে। কেননা আমদানি, রপ্তানি, কৃষি, খাদ্য, জ্বালানি, উন্নয়ন প্রকল্পসহ নানা বিষয়ে বাংলাদেশ যুদ্ধরত দেশ দু'টোর সাথে জড়িত। বাংলাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হতে পারে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

➢ রাশিয়া ও ইউক্রেনে রপ্তানি হ্রাস

বিগত এক দশকে রাশিয়া ও ইউক্রেনে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বেড়েছে। রাশিয়াতে ২০১১-১২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় যেখানে ছিল ১৩৩ মিলিয়ন ডলার, চলতি অর্থবছরের শুরুতে এসে তা দাঁড়িয়েছিল ৬৬৫ মিলিয়ন ডলারে। রাশিয়ায় রপ্তানিকৃত পণ্যের ৯০% হলো তৈরি পোশাক। অপরদিকে ইউক্রেনে চলতি অর্থবছরে ২৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। ইউক্রেন রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে প্রধান হলো তৈরি পোশাক (৪৪%), শাকসবজি (২৫.৫%) এবং জুতা জাতীয় পণ্য (২১.৪৫%)। রাশিয়া যখন একের পর এক শহরে হামলা চালাচ্ছে তখন ইউক্রেনের পক্ষে একই পরিমাণ পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে।

বর্তমানে চলমান যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ কমে আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার উপর নানা রকম নিষাধাজ্ঞা আরোপ করার ফলে এবং রাশিয়ার বড় ব্যাংকগুলোকে বৈশ্বিক লেনদেনের সিস্টেম SWIFT থেকে বাদ দেওয়ার ফলে রাশিয়ার সাথে আর্থিক লেনদেন কঠিন হয়ে পড়েছে। যে সকল পণ্য ইতোমধ্যে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলোর মূল্য পাওয়া নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশের উপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব

➢ মোট রপ্তানি আয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা

বাংলাদেশ রপ্তানি বাবদ যত অর্থ আয় করে তার অর্ধেকেরও বেশি (৫৮%) আসে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো থেকে। ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ যদি নিকট ভবিষ্যতে থেমে যায় তবে বাংলাদেশের হয়তো রপ্তানিতে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না। কেননা বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ২% হয় এই দেশ দুটোতে। কিন্তু রাশিয়া যদি তার আগ্রাসন ইউক্রেন ছাড়িয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর দিকেও বাড়ায় তবে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো বড় ধরনের ক্ষতির শিকার হবে যাদের রপ্তানির মূল ক্রেতাই ইউরোপের দেশগুলো। পূর্ণমাত্রার সামরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে ক্রয়াদেশ কমে যাবে। ফলে ভুক্তভোগী হবে বাংলাদেশ। এছাড়া বর্তমান চলমান যুদ্ধের কারণেই জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে এসেছে। যার ফলে এসব দেশ থেকে আমদানির পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে।

➢ আমদানি-রপ্তানি কঠিন ও ব্যয়বহুল হওয়া

ইউক্রেনে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করার কারণে রাশিয়াকে শাস্তিস্বরূপ ৩২টি দেশ তাদের আকাশসীমা ব্যবহার করা থেকে নিষিদ্ধ করেছে। এই দেশগুলোর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কানাডাও রয়েছে। রাশিয়ার উপর দিয়ে আকাশপথ ও রাশিয়ার বিমান পরিবহণ ব্যবহার করতে না পারার কারণে এশিয়া ও এশিয়ার বাইরে বেশ কিছু দেশে বাংলাদেশি পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে দূরত্ব ও খরচ দুটিই বেড়ে গিয়েছে। আবার যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী পণ্যবাহী জাহাজের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি যদিও Free on Board (FoB) পদ্ধতিতে করা হয় বলে রপ্তানি ব্যয় বাড়েনি কিন্তু আমদানি করার সময় Coast and Freight ভিত্তিতে করা হয় ফলে পণ্যবাহী জাহাজ ভাড়া বেড়ে যাওয়ার দরুন আমদানি খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব

➢ খাদ্যপণ্য মূল্যের উপর প্রভাব

যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার উপর পণ্য রপ্তানিতে যেমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তেমন ইউরোপের রুটির ঝুড়ি হিসেবে বিখ্যাত ইউক্রেনের হাতে থাকা ২০ মিলিয়ন টন শস্য রপ্তানি করতে পারছে না। যুদ্ধের কারণে নতুন ফসল কাটাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশ তার বার্ষিক গমের চাহিদার ৮০ শতাংশই আমদানি করে আর আমদানিকৃত গমের ৫০ শতাংশই আসে রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে। যুদ্ধের কারণে আমদানি বাধাগ্রস্ত হওয়ায় বিশ্ববাজারে গমের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রতি টন গমের দাম যেখানে জানুয়ারিতে ছিল ৩৩৪.৫ ডলার সেটা মার্চে এসে দাঁড়ায় ৩৫৩ ডলারে। এর ফলে আমাদের দেশেও গমের আটা, ময়দা ও এগুলো দিয়ে বানানো খাদ্যপণ্যসমূহের দাম বেড়ে গেছে। অপর দিকে বাংলাদেশ সরাসরি রাশিয়া বা ইউক্রেন থেকে ভোজ্য তেল আমদানি না করলেও বিশ্ব বাজারে সংকট দেখা দেওয়ায় অনেক দেশই সয়াবিন বীজ ও তেল রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশেও ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়ে জনজীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে।

➢ কৃষি ক্ষেত্রে সংকট

কৃষিক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো রাসায়নিক সার। আর রাশিয়া ও বেলারুশ ২টি দেশই বিশ্বের বৃহত্তম পটাশ সারের রপ্তানিকারক। যুদ্ধের ফলে এ ২টি দেশ সার রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে সারের মূল্যে প্রভাব ফেলতে পারে। একই সাথে ইউরিয়া সারের মূল কাঁচামাল যে প্রাকৃতিক গ্যাস, সেটারও ২য় বৃহত্তম উৎপাদক রাশিয়া তার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ পুরো পৃথিবীর পাশাপাশি বাংলাদেশেও সারের যোগানে প্রভাব ফেলবে। পাশাপাশি মুরগীর খাদ্যের কাঁচামালের ৬০ শতাংশই আমদানি করতে হয় যার বড় যোগানদাতা ইউক্রেন। পোল্টিফিডের দাম বাড়ার সাথে তাল দিয়ে মাংস ও ডিমের দামও বেড়েছে।

বাংলাদেশের উপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব

➢ জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত

বিশ্বের মোট প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের ১৭% এবং মোট জ্বালানি তেলের ১২% উৎপাদন করে রাশিয়া যথাক্রমে ২য় ও ৩য় অবস্থানে আছে। রাশিয়ান তেল ও গ্যাস রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম স্মরণকালের মধ্যে সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছে। প্রতি ব্যারেল ক্রুড তেলের দাম জানুয়ারিতে যেখানে ছিল ৫০ ডলার, এপ্রিলে এসে তা দাঁড়ায় ১৩৯ ডলারে। যা গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই বাড়তি দাম মোকাবেলা করতে বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিদিন প্রায় ১৫ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়েছে। পাশাপাশি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) এর আমদানি ব্যয়ও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশ যদিও LNG চাহিদা কাতার ও ওমান থেকেই মেটায়। কিন্তু ইউরোপের দেশগুলো রাশিয়ার উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশগুলোর থেকেই গ্যাস সংগ্রহের চেষ্টা করছে। ফলে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি বাংলাদেশে যোগাযোগ, ইলেক্ট্রিসিটি, খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য পণ্য সকল কিছুরই মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব ফেলে।

➢ উন্নয়ন প্রকল্পে বিরূপ প্রভাব

প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল উন্নয়ন প্রকল্প। এর ৯০ শতাংশ অর্থায়ন করছে রাশিয়ার রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক। যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার বেশিরভাগ ব্যাংকে নিষেধাজ্ঞা থাকায় এই প্রকল্পে অর্থায়ন করা জটিল হয়ে পড়বে। ৬০০০ রাশিয়ান, বেলারুশিয়ান, কাজাখস্তানিয়ান কর্মীসহ প্রায় ২৬০০০ লোকবল কাজ করছে এই প্রকল্পে। এই প্রকল্পে অর্থায়নের বিকল্প উপায় খুঁজে বের করতে না পারলে কাজের অগ্রগতি ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্ক রয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

টেকসই উন্নয়ন:

২০০০-২০১৫ সাল সময়কালে Millennium Development Goals (MDGs) এর সফলতার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), অনুষ্ঠানে টেকসই উন্নয়ন বা SDGs এর ধারণার উদ্ভব ঘটে, যা কার্যকর হয় ২০১৫ সালে।

- ✓ **SDGs এর মূলমন্ত্র হলো:** 'Leave no one behind'.
- ✓ **মোট Goal/অভীষ্ট:** ১৭টি, UNDP'র মতে যার নাম 'Global Goals'.
- ✓ **Targets/লক্ষ্যমাত্রা:** ১৬৯টি।
- ✓ **Indicators/সূচক:** ২৩২টি।
- ✓ **সময়কাল:** জানুয়ারি, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০৩০।
- ✓ **Headline:** "Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development."
- ✓ মূল উদ্দেশ্য/ক্ষেত্র: 5P→ People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership.

SDG

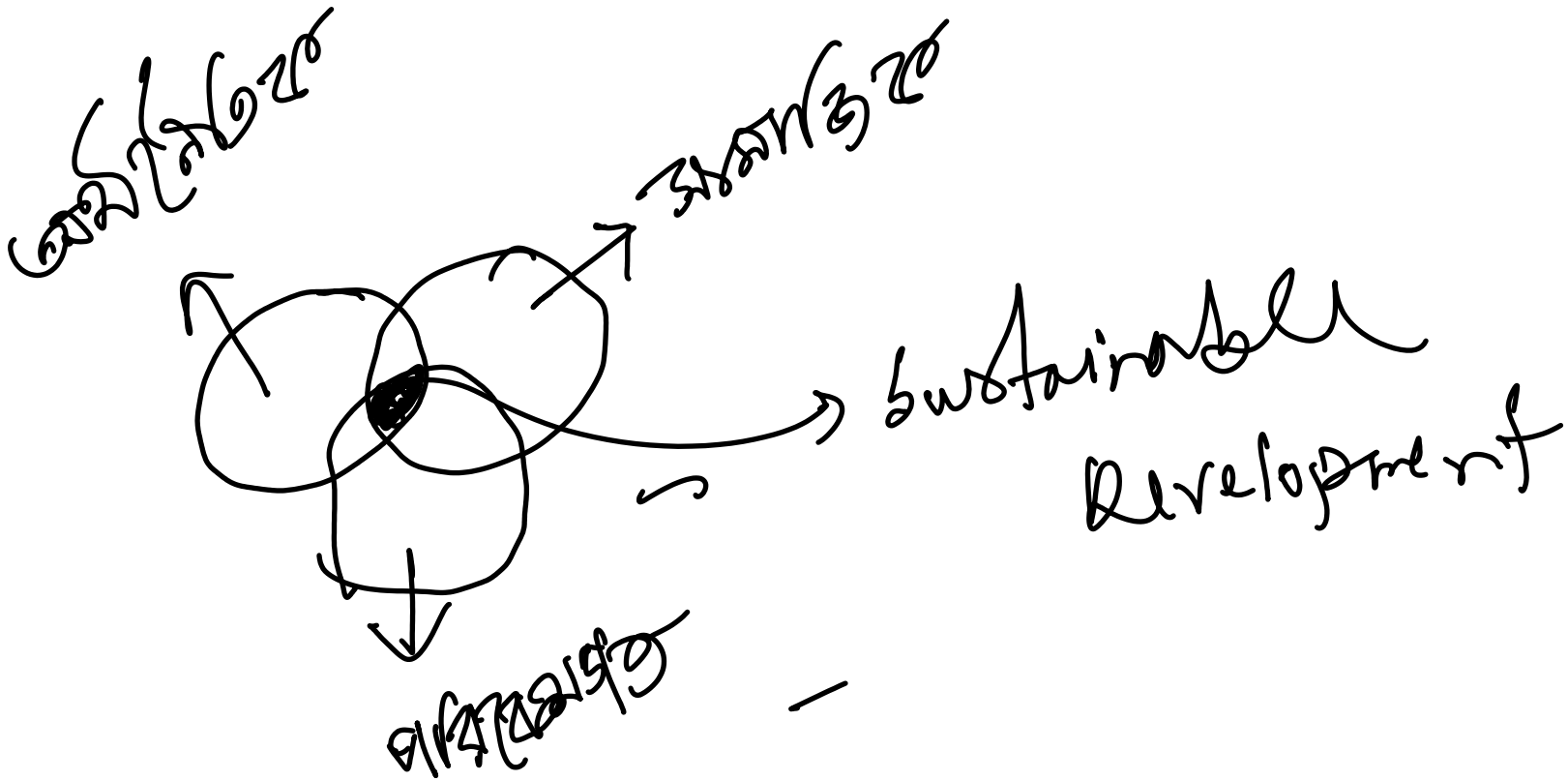

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

বাংলাদেশ ও এসডিজি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "এসডিজি সূচকে এগিয়ে থাকা শীর্ষ তিন দেশের একটি হলো বাংলাদেশ।" "Sustainable Development Report-2021" অনুসারে বিশ্বের ১৬৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম।

- ✓ SDGs এর প্রধান সমন্বয়ক: ড. মো: আবুল কালাম আজাদ।
- ✓ বাংলাদেশ সরকারের দেয়া ১৯টি গোলের মধ্যে ১৫টিই জাতিসংঘ SDGs এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে।
- ✓ সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় SDGs এর ১১টি গোল গ্রহণ করে এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হতে সবগুলো গোল বাস্তবায়ন করছে।
- ✓ এসডিজির টার্গেটসমূহ Annual Performance Agreement (APA) তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

SDGs

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

এসডিজির লক্ষ্যসমূহ ও বাংলাদেশের গৃহীত কর্মসূচি

গোল – ০১: দারিদ্র্য বিলোপ: সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান।

লক্ষ্যমাত্রা (Targets):

- ✓ বর্তমানে বিশ্বের প্রতি ১০ জনের ১ জন প্রতিদিন জীবিকা নির্বাহের জন্য ১.২৫ ডলার এর কম ব্যয় করতে সক্ষম, যাকে চরম দারিদ্র্য বলে। ২০৩০ সালের মধ্যে এ চরম দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
- ✓ দরিদ্র মহিলা, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা।
- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- ✓ দারিদ্র্য দূরীকরণে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ করা।

Graph

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

- ✓ বাংলাদেশে প্রতিদিন ১.৯০ মার্কিন ডলারের কম (PPP ভিত্তিতে) ব্যয় চরম দারিদ্র্য বলে ধরা হয়। ২০১০ সালে চরম দারিদ্র্য ছিল ১৮.৫% যা ২০২২ সালে ১০.৫%, বর্তমানে ৫.৬% (এপ্রিল ২০২৩) এবং ২০৩০ সালে হবে ২.৩%।
- ✓ ২০১০ সালে দারিদ্র্য ছিল ৩১.৫%, যা ২০২২ সালে ২০.৫%। বর্তমানে ১৮.৭% (এপ্রিল ২০২৩) এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৯.৭% কমিয়ে আনার লক্ষ্য সরকারের।
- ✓ ১২০টিরও বেশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চলমান আছে।
- ✓ SDGs স্থায়ীকরণের কাজ চলছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ০২: ক্ষুধামুক্তি

ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার।

লক্ষ্যমাত্রা:

২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা মুক্তি, অপুষ্টি দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

- ✓ ২০২০ সালের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ ২০৩০ সালের মধ্যে অপুষ্টির হার ১০% এ নামিয়ে আনার জন্য সরকার কাজ করছে।
- ✓ বাংলাদেশ ২০১৩ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।
- ✓ ৫ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে পুষ্টিহীনতা –

সাল	পুষ্টিহীনতার হার
২০১৬	১৬.৪%
২০১৮	১৪.৭%

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ০৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।

লক্ষ্যমাত্রা:

- ✓ ২০৩০ সালের মধ্যে ১ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার হাজারে ১২ জনের কমে আনা।
- ✓ ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার হাজারে ২৫ জনের কম।
- ✓ মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি লাখে ৭০ জনের কম।
- ✓ বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

- ✓ বর্তমানে ১ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১৫ জন এবং ৫ বছরের কম বয়সী প্রতি হাজারে ২১ জন।
- ✓ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩ অনুসারে, মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি লাখে ১৬১ জন।
- ✓ দক্ষ ডাক্তার দ্বারা মাতৃসেবার হার ২০১৯ এ ছিল ৫৯% যা ৬৫% এ উন্নীত করার কাজ চলমান রয়েছে।
- ✓ বর্তমানে ডাক্তার প্রতি রোগীর সংখ্যা ১৮৪৭ জন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ০৪: গুণগত শিক্ষা

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি।

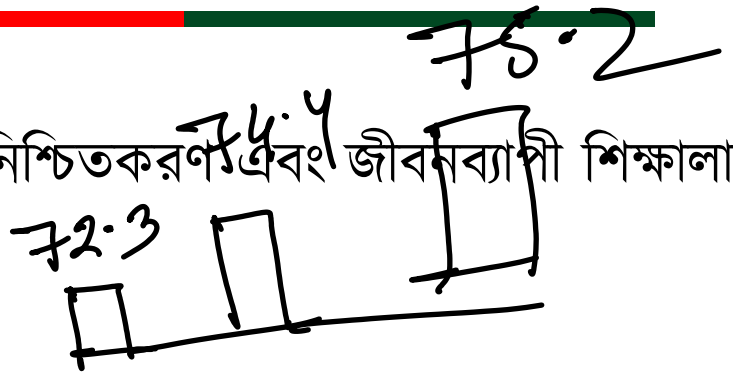

লক্ষ্যমাত্রা:

- ✓ ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষায় ছেলে মেয়ে সমান উপস্থিতি।
- ✓ ২০৩০ সালের মধ্যে বিনামূল্যে সকলের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

- ✓ ২০২২ সালের সমীক্ষা অনুসারে, স্বাক্ষরতার হার ৭৫.২%।
- ✓ বর্তমানে শিক্ষায় জেন্ডার সমতা

পর্যায়	২০১৫	২০১৯	২০২৩
প্রাথমিক	১.০৮	১.০৭	১.০২৭
মাধ্যমিক	১.১৩	১.১৯	১.২৪

- ✓ বিনামূল্যে বই বিতরণ, মিড ডে মিল ও টিফিন ভাতাসহ সরকার মাধ্যমিক পর্যন্ত উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে।
- ✓ বছরের প্রথম দিনে সারাদেশে বই বিতরণ কার্যক্রম চালু।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ০৫: লিঙ্গ সমতা

লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।

লক্ষ্যমাত্রা:

- ✓ ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ রোধ।
- ✓ সর্বত্র নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ।
- ✓ নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

- ✓ ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে জেন্ডার বাজেট বৃদ্ধি পায় ৪৩%।
- ✓ Gender Gap Index-2022 এ বাংলাদেশ ৭১তম (১৫৩টির মধ্যে) এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নারী বৈষম্য রোধে প্রথম বাংলাদেশ।
- ✓ নারীকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের জন্য চাকুরির বাজারের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষিত হয়েছে কোটা। ২০১০ সালে প্রায় ১৬.২ মিলিয়ন নারী শ্রমশক্তিতে থাকলেও ২০২২ নাগাদ তা হয় প্রায় ২০ মিলিয়ন।
- ✓ জাতিসংঘের CEADAW সনদ অনুমোদনের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্যরোধে ও নির্যাতন বন্ধে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নিয়েছে।
- ✓ বর্তমানে নির্বাচিত ২২ জন ও সংরক্ষিত ৫০টি আসনসহ ৭২ জন সংসদ সদস্য নারী (২১.৬৮%), ৫ জন মন্ত্রী রয়েছে এবং সংসদের স্পিকার একজন নারী। প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীও নারী।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ০৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা:

- ✓ ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০% নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী নিশ্চিতকরণ।
- ✓ ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০% স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়া নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

- ✓ ২০২২ সালের মধ্যে সুপেয় পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৮.৩ শতাংশ।
- ✓ ২০২২ সালে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৮১.৫ শতাংশ, যা ২০৩০ সালেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে।
- ✓ ৭৪.৮% পরিবার সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার অনুশীলন করে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

৭ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি

গোল – ০৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি

সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা।

লক্ষ্যমাত্রা:

- ✓ ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করে টেকসই জ্বালানি (পরিবেশবান্ধব) নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

- ✓ Power cell এর তথ্যানুযায়ী (২১ মার্চ, ২০২২) বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে শতভাগ জনগণ।
- ✓ "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই স্লোগানকে সামনে রেখে সরকার ২০২১ সালের মধ্যেই ১০০% জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুতের আওতায় এনেছে।
- ✓ বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ৯০৯ মেগাওয়াট, যা মোট উৎপাদনের ৪%। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৪০% এ নিতে কাজ করছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ০৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

লক্ষ্যমাত্রা:

- ✓ ২০২০ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার ৩% কমানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করা।
- ✓ ২০৩০ সালের মধ্যে GDP Growth গড়ে ৭% রাখা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

- ✓ ২০১৭ সালে BBS এর জরিপে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ছিল ৪.২ শতাংশ। সর্বশেষ জরিপে তা কমে ৩.৬ শতাংশে দাড়িয়েছে।
- ✓ ICT উন্নয়নের ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে ২ লক্ষ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক অঞ্চল, ফাস্ট ট্রাক প্রজেক্টের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকার কাজ করছে।
- ✓ ২০১৫ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত গড় GDP প্রবৃদ্ধি ৬.৬% এর উপরে।
- ✓ বাংলাদেশ বর্তমানে GDP প্রবৃদ্ধিতে বিশ্বে তৃতীয়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ০৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তি মূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনের প্রসারণ।

লক্ষ্যমাত্রা:

- ✓ স্থিতিশীল উন্নয়ন ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

- ✓ আইসিটি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হাইটেক পার্ক, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ফাস্ট ট্রাক প্রজেক্ট, a2i, প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।
- ✓ বঙ্গবন্ধু স্যাটালাইট-১ উৎক্ষেপণ, সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়া।
- ✓ 4G ও 5G প্রযুক্তি চালুকরণ।

৯ শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

১০ অসমতা হ্রাস

গোল – ১০: অসমতার হ্রাস

অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা।

লক্ষ্যমাত্রা:

- ✓ মাথাপিছু আয়সীমার মধ্যে নিচের দিকে থাকা ৪০% এর আয় গড় জাতীয় আয়ের উপরে নিয়ে আসা।
- ✓ বিদেশ থেকে Remittance পাঠানোর ব্যয় ৩% এর মধ্যে রাখা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

- ✓ Commitment to Reducing Inequality (CRI) সূচকে ২০২২ সালে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭তম। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ দ্বিতীয়।
- ✓ প্রবাসী ও তাদের পরিবারগুলোকে নিরাপদ অভিবাসন ও সুরক্ষা নিশ্চিত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ অনুমোদন করেছে।
- ✓ বর্তমানে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালে ক্ষেত্র বিশেষে ২% পর্যন্ত প্রণোদনা পাওয়ার কার্যক্রম চলমান।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ১১: টেকসই নগর ও জনপদ

অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা।

লক্ষ্যমাত্রা:

- ✓ মানব বসতি শহরগুলোকে নিরাপদ ও টেকসই করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

- ✓ বাংলাদেশে শহরে প্রায় ৪৪% মানুষ অস্থায়ী আবাসনে বসবাস করে এবং প্রায় ২৯% আধা স্থায়ী আবাসনে বাস করে।
- ✓ সরকারের "আমার গ্রাম আমার শহর" আশ্রয়ণ প্রকল্প-১, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২, রাজউক নিরাপদ বসতি ও টেকসই শহর নিশ্চিতকরণে কাজ করছে।
- ✓ ২০৩৫ সালে প্রায় ৫০% মানুষ শহরে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৮০% মানুষ শহরে বাস করবে বলে প্রক্ষেপিত হয়েছে।
- ✓ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১ – ২০৪১) এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০-তে নগর পরিবেশের স্থায়িত্ব, মান উন্নয়ন এবং টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত নীতিগত মৌলিক সুপারিশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ✓ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকাভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ করা।
- ✓ ভূমিকম্প সহনশীল ভবন নির্মাণ করা।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন

পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা:

✓ উৎপাদন ও সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

✓ যশোর শহরটি সম্প্রতি স্মার্ট সিটি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।
✓ সিলেট সিটি কর্পোরেশন গ্রিন সিটি ধারণা এবং নাগরিকদের উদ্যোগে বর্জ্য ব্যবহার করে সার উৎপাদন করছে।
✓ গাজীপুরের কালিয়াকৈর-এ সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণ।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম:

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ।

১৩ জলবায়ু কার্যক্রম

লক্ষ্যমাত্রা:

- ✓ ২০৩০ সালের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পদক্ষেপ।
- ✓ টেকসই অভিযোজন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- ✓ সকল জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতিমালায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত করা।
- ✓ ২০২০ সালের মধ্যে UNFCCC এর মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহ হতে তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ১০০ বিলিয়ন ডলার আদায়।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনে নেতৃত্বের ভূমিকাস্বরূপ ৪৮টি দেশের জোট CVF (Climate Vulnerable Forum) এর ২০২০-২২ মেয়াদে সভাপতি ছিল বাংলাদেশ।
- ✓ Disaster Risk Reduction Strategies of Bangladesh (2016-2030) প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

- ✓ Mujib Climate Prosperity Plan নামে কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে UN কর্তৃক নির্ধারিত NDC (Nationally Determined Contribution) মূল্যায়ন হবে।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০ প্রণয়ন করার মাধ্যমে Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) গঠন করে। ২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত এতে মোট ৩৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।
- ✓ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১ কোটি গাছের চারা রোপণ করা হয়।
- ✓ জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য দেশের প্রথম ও বিশ্বের বৃহৎ আশ্রয়ণ প্রকল্প 'খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প' করা হয়।
- ✓ আশ্রয়ণ প্রকল্প – ২ (২০১০-২০২৪) এর মাধ্যমে মোট ৮.৮২ লাখ পরিবারকে এর আওতায় আনা হবে। এ পর্যন্ত ২১৩২২৭টি পরিবারকে ও আশ্রয়ণ প্রকল্প – ১ (১৯৯৭-২০০২) এর মাধ্যমে প্রায় ১.০৬ লাখ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।
- ✓ প্রধানমন্ত্রী প্যারিস চুক্তির কঠোর বাস্তবায়নে 'জলবায়ু ন্যায়বিচার' ধারণাটি উদ্ভাবন করেছেন।
- ✓ ২০১৮ সালে বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা – ২১০০ প্রণয়ন করে এর বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে (২০১৮-২০৩০) ৮০টি প্রকল্প নিয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ১৪: জলজ জীবন

টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার।

লক্ষ্যমাত্রা:

- ✓ টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ✓ ২০১৫ সালের মধ্যে সামুদ্রিক দূষণ বন্ধ করা।
- ✓ ২০২০ সালের মধ্যে অন্তত ২০ শতাংশ সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

- ✓ বঙ্গোপসাগরে Swatch of no Ground এর চারপাশের চারটি অঞ্চলকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত/সুরক্ষিত অঞ্চল (Marine Protected Area) ঘোষণা করা হয়েছে।
- ✓ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে মোট সামুদ্রিক এলাকার ২.৫% সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়।
- ✓ SDGs: Bangladesh Progress Report – 2020 অনুযায়ী বর্তমানে সামুদ্রিক এলাকার ২.০৫% সংরক্ষিত এলাকা আছে।
- ✓ Blue Economy-র টেকসই ভোগে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ১৫: স্থলজ জীবন

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবহার, মরুকরণ, ভূমি ক্ষয়রোধ ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

লক্ষ্যমাত্রা:

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

- ✓ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ১৮(ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়।
- ✓ ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত 'চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত হন।
- ✓ SDG goal অনুসারে, ২০২০ সালের মধ্যে ২০% বনভূমি স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছিল, বর্তমানে আছে ১৭%।
- ✓ ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা হয়েছে।
- ✓ সংরক্ষিত অরণ্যে গাছ কাটার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ২০২২ সাল অবধি বাড়ানো হয়েছিল।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থা, ন্যায় বিচারের পথ সুগম ও সকল স্তরে কার্যকর জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন।

লক্ষ্যমাত্রা:

- ✓ শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ, ন্যায়বিচার, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

- ✓ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য ২০০৭ সালে 'নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ' সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে করা হয়েছে।
- ✓ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ✓ প্রতি লাখে ২০১৫ সালে মানবপাচারের শিকার হয়েছিল ০.৮৭ যা ২০২০ সালে হ্রাস পেয়ে ০.৬১ এ দাঁড়িয়েছে।
- ✓ সরকার আটক অবস্থায় নির্যাতন ও মৃত্যুরোধ আইন ২০১৩ পাশ করেছে।
- ✓ বিভিন্ন স্বাধীন কমিশন (দুদক, তথ্য কমিশন) ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার কাজ করছে।

১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গোল – ১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালীকরণ।

১৭ অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

লক্ষ্যমাত্রা:

✓ বৈশ্বিক উন্নয়নের জন্য উপায় নির্ধারণ ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বে স্থিতিশীলতা আনায়ন।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

✓ বাংলাদেশ বিভিন্ন আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে এসডিজি বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

✓ বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে। যেমন: NDB, ASEAN. ইতোমধ্যে NDB এর সদস্য হয়েছে।

✓ যদিও এই গোলটি প্রধানত উন্নত দেশসমূহের জন্য, তথাপি বাংলাদেশ BIMSTEC, SAARC, BBIN, D-8, CIRDAP সহ বিশ্বের নানান প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

চ্যালেঞ্জসমূহ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের চারটি চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত লুইস ফারনান্দো কারিরা ক্যাস্ট্রো। লুইস ফারনান্দো কারিরা ক্যাস্ট্রো বলেন, "এসডিজি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে শক্তিশালী সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা। এগুলো মোকাবিলা করা গেলে এসডিজির বাস্তবায়ন সম্ভব।"

এছাড়াও যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে –

- ✓ টেকসই কৃষি উৎপাদনশীল প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে চরম দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্ষুধা মোকাবিলা করা।
- ✓ ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক রূপান্তর ও টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা।
- ✓ করোনা মহামারির প্রভাব মোকাবিলা করে অর্থনীতির গতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।
- ✓ জেন্ডার সমতা ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রসার ও জেন্ডার ভায়োলেন্স কমিয়ে আনা।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও কম কার্বন নিঃসরণকারী ও জলবায়ু অভিঘাতসহনশীল উপায়সমূহ অবলম্বন করা।
- ✓ পর্যাপ্ত সম্পদ আহরণ ও এর যথোপযুক্ত ব্যবহার।
- ✓ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করা।
- ✓ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা।
- ✓ সুশাসন ব্যবস্থা জোরদার করা।
- ✓ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা।
- ✓ আয় বৈষম্যের সাথে আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো।
- ✓ সর্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।
- ✓ জনমিতিক লভ্যাংশ কাজে লাগানো।
- ✓ সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি সরবরাহ করা।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অবদান

- **UNDP এর ভূমিকা:** এসডিজি বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করছে ইউএনডিপি। দারিদ্র্য নিরসন, লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসকরণসহ ১৭টি অভীষ্ট অর্জনে ইউএনডিপি দেশসমূহকে নানান সম্পদ ও তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করছে।

- **সরকারি খাতের ভূমিকা:** বাংলাদেশে এসডিজির অর্থায়নের ৩৪ শতাংশই আসে সরকারি খাত হতে। এছাড়াও সরকার এসডিজি বাস্তবায়নে Annual Performance Agreement (APA) তে এসডিজির অভীষ্টগুলো অন্তর্ভুক্ত এবং এসডিজি ওরিয়েন্টেড বাজেট তৈরি করছে।

- **বেসরকারি খাতের ভূমিকা:** বেসরকারি খাতসমূহ সরকারি খাতের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন করছে। এক্ষেত্রে এসডিজি অর্থায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মোট অবদান ৪২ শতাংশ।

- **এনজিওর ভূমিকা:** এনজিওসমূহ এসডিজি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

অর্থায়ন

অর্থবছর	অভ্যন্তরীণ উৎস	বাহ্যিক উৎস
২০১৭-২০২০	১০৭.৭২ বিলিয়ন ডলার	২২ বিলিয়ন ডলার
২০২১-২০২৫	২৫৭.৪৯ বিলিয়ন ডলার	৪৯ বিলিয়ন ডলার
২০২৬-২০৩০	৪৩০.৮৭ বিলিয়ন ডলার	৬৭ বিলিয়ন ডলার
মোট (২০১৭-২০৩০)	৭৯৬ বিলিয়ন ডলার (মোট অর্থায়নের ৮৫.১১%)	১৩২ বিলিয়ন ডলার (মোট অর্থায়নের ১৪.৮৯%)

[Source: GED]

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ফলে সারাবিশ্ব প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসেছে নতুন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা। বর্তমানে কৃষি থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, অফিস-আদালত দেশের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তার স্পর্শ রাখেনি। এর ছোঁয়ায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিন দিন বেড়েই চলেছে। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

- **বিনিয়োগ:** ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক লেনদেন সহজে ও দ্রুত সম্পন্ন করা যাচ্ছে। মানুষের বিনিয়োগ ক্ষমতা ও সুযোগ বেড়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কম সময়ে বিনিয়োগ করা এবং অপরদিকে বিনিয়োগ সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।
- **কর্মসংস্থান:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ফলে নতুন ধরনের পেশা ও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষত আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে অনেক শিক্ষিত তরুণের কর্মসংস্থান হচ্ছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।
- **আউটসোর্সিং:** কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ নিজেরা না করে তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে করিয়ে নেওয়াকে আউটসোর্সিং বলে। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এখন দেশের শিক্ষিত সমাজের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এখন এসব মার্কেটপ্লেসে নিজের পছন্দ মতো কাজগুলো খুঁজে নিচ্ছে।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ

- **ব্যবসায় উদ্যোগ:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নতুন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। একটি উদ্যোগ বদলে দিতে পারে একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি। তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহার উদ্যোক্তা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মোটকথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নতুন উদ্যোগের অপর সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
- **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কম জনশক্তি দিয়ে অধিক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কর্মী প্রতি ব্যয় কমেছে, তদুপরি কর্মীদের কাছ থেকে অনেক বেশি কাজ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বিনিয়োগ কম লাগছে এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা রাখছে।
- **ক্ষুদ্র ব্যবসায়:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসার ভূমিকা ব্যাপক। বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন নতুন ব্যবসার দ্বার উন্মোচন হচ্ছে। ব্যবসায়ের ধরন অনলাইন কিংবা অফলাইন যে কোনোটাই হতে পারে।
- **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে যোগাযোগ ক্ষেত্রে। পূর্বে যোগাযোগের জন্য হয়তো মাসের পর মাস লেগে যেত, সেটা এখন নিমেষেই করা সম্ভব হচ্ছে। বড় বড় ফাইল এখন মুহূর্তের মধ্যেই ট্রান্সফার করা সম্ভব হচ্ছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে। সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়ে এসেছে গতিশীলতা, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ

- **শিক্ষা বিস্তার:** শিক্ষা হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথ্যকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে। ডিজিটাল ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে। অনলাইনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা, পরীক্ষা দেয়া কিংবা শিক্ষামূলক বিভিন্ন ওয়েবসাইট হতে শিক্ষা লাভ করা যায়। আর ইন্টারনেট ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে ঘরে বসে শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার এই পদ্ধতিটাকে ই-লার্নিং বলে।
- **ই-গভর্নেন্স:** তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে সরকারি সেবাসমূহ কম্পিউটারাইজড ও অনলাইনভিত্তিক হচ্ছে। এতে সরকারের নাগরিক সুবিধা জনগণ সহজেই নিতে পারছে এবং সরকারের জবাবদিহিতা বাড়ছে। দেশের উন্নয়নের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে কাজের সুসমন্বয় ঘটানো যায়।
- **ই-কমার্স:** ই-কমার্স হচ্ছে অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় দিক। পণ্য কেনাবেচা ও আর্থিক লেনদেনের ইলেকট্রিক সংস্করণ-এর ফলে অর্থনৈতিক লেনদেন ও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় উদ্যোগের পথ সুগম হচ্ছে। ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যক্রম এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। ইন্টারনেট বা অন্য কোন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় করাকে ই-কমার্স বলে।
- **ই-কৃষি:** কৃষি উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। কৃষি বিষয়ে তথ্য, গবেষণা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে তথ্য প্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আবহাওয়া, ফসল বপন ও পরিচর্যা, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের তথ্য, রোগবালাই দমন ইত্যাদি কৃষিতথ্য অনলাইনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কৃষকরা জানতে পারছে। কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকরা সচেতন হচ্ছে, যা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছে।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ

- **ই-ব্যাংকিং:** একটি দেশের আর্থিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি ব্যাংক ব্যবস্থা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে ব্যাংকিং খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **মোবাইল ব্যাংকিং:** দেশে মোবাইল ফোন নির্ভর ব্যাংকিং সেবা চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী যাদের স্বাভাবিক ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ নেই, তাদের জন্য সে সেবার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। নিরাপদ ও সহজ আর্থিক লেনদেন সুবিধার কারণে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অর্থ প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

- **নারী উন্নয়ন:** তথ্য প্রযুক্তি নারী উন্নয়নে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ঘরে ঘরে তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে ঘরে বসেই নারীরা বিভিন্ন বিষয় জানতে পারছে, যা তাদেরকে অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তুলছে। সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে নতুন কর্মসংস্থানের।

- **পরিবেশ সংরক্ষণ:** পরিবেশ সংরক্ষণ ছাড়া কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে পরিবেশের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়। তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশ সংরক্ষণেও অবদান রাখছে। তথ্য প্রযুক্তি পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগেরও সুযোগ সৃষ্টি করছে তথ্য প্রযুক্তি।

লৈঙ্গিক সমতা

নারীর ক্ষমতায়নে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

➢ নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের সংগঠন প্রতিষ্ঠা:

(a) **UNIFEM:** ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে United Nations Development Fund for Woman. সংগঠনটির সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের New York শহরে।

(b) **UN Women:** নারীর উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য ২০১০ সালে জাতিসংঘ একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে যার নাম UN Women. এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে। ২০১১ সালে UNIFEM এই সংগঠনটির সাথে একীভূত হয়ে যায়।

➢ নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য কনভেনশন প্রণয়ন:

(a) ১৯৫১ সালে জাতিসংঘ নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্য দূর করার জন্য একটি কনভেনশন প্রণয়ন করে।

(b) ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একটি কনভেনশন প্রণয়ন করে।

(c) ১৯৬২ সালে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন এর ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ এবং সম্মতি নেয়ার বিধান রেখে একটি কনভেনশন প্রণয়ন করে জাতিসংঘ।

(d) ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) প্রণয়ন করেন। CEDAW কার্যকর হয় ১৯৮১ সালে। এ পর্যন্ত ১৮৯টি স্বাধীন দেশ CEDAW অনুমোদন করেছে। তবে ৬টি স্বাধীন দেশ CEDAW এখনো অনুমোদন করেনি। দেশগুলো হলো: ইরান, টোংগা, সুদান, সোমালিয়া, ভ্যাটিকান সিটি এবং যুক্তরাষ্ট্র। CEDAW তে মোট ৩০টি অনুচ্ছেদ আছে। ৩ সেপ্টেম্বর CEDAW দিবস। এর স্লোগান হচ্ছে – "Women Rights are Human Rights"।

লৈঙ্গিক সমতা

➢ **সম্মেলন আয়োজন:**

ক্রমিক নং	সাল	শহর	দেশ	অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা
১ম	১৯৭৫	মেক্সিকো সিটি	মেক্সিকো	১৩৩
২য়	১৯৮০	কোপেনহেগেন	ডেনমার্ক	১৪৫
৩য়	১৯৮৫	নাইরোবি	কেনিয়া	১৫৭
৪র্থ	১৯৯৫	বেইজিং	চীন	১৮৯

বেইজিং সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল প্রতি ৫ বছর পরপর বিশ্বের দেশগুলো নারী উন্নয়নের অগ্রগতি বিষয়ে সম্মেলনে মিলিত হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলন	সাল	সম্মেলন	সাল
বেইজিং + ৫ সম্মেলন	২০০০ সালে	বেইজিং + ১৫ সম্মেলন	২০১০ সালে
বেইজিং + ১০ সম্মেলন	২০০৫ সালে	বেইজিং + ২০ সম্মেলন	২০১৫ সালে

➢ **দিবস ঘোষণা:** জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো ৮ মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে। এছাড়া ২৫ নভেম্বর উদ্‌যাপিত হয় নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ দিবস হিসেবে।

➢ **MDGs ও SDGs নারীর ক্ষমতায়ন অন্তর্ভুক্তকরণ:** MDGs এর ৩ ও ৫ নং গোলে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া SDGs এর ৫ নং গোলেও সরাসরি নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি স্থান পেয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ

গত ১১ বছরে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১৮ সালের ১২ জুলাই, ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকায় এক মন্তব্য প্রতিবেদনে শিরোনাম করা হয় Women Empowerment: Bangladesh sets example for the world। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের সফলতাসমূহ

- **নারী শিক্ষার প্রসার:** ২০০৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিশু ভর্তির হার ছিল ৫৭%। ২০১৯ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৯৭.৪%।
- **কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি:** ২০১০ সালে বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা ছিল ১৬.২ মিলিয়ন। ২০২০ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ মিলিয়নে।
- **নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রীর অর্জনসমূহ:** নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাপক কাজ করছেন। আন্তর্জাতিকভাবে যার স্বীকৃতিও মিলেছে। ২০১৬ সালে UN Women প্রধানমন্ত্রীকে Planet 50-50 Championship Award – এ ভূষিত করেন। এছাড়াও তিনি ২০১৬ সালে Global Partnership Program কর্তৃক Agent of Change পুরস্কার লাভ করেন।

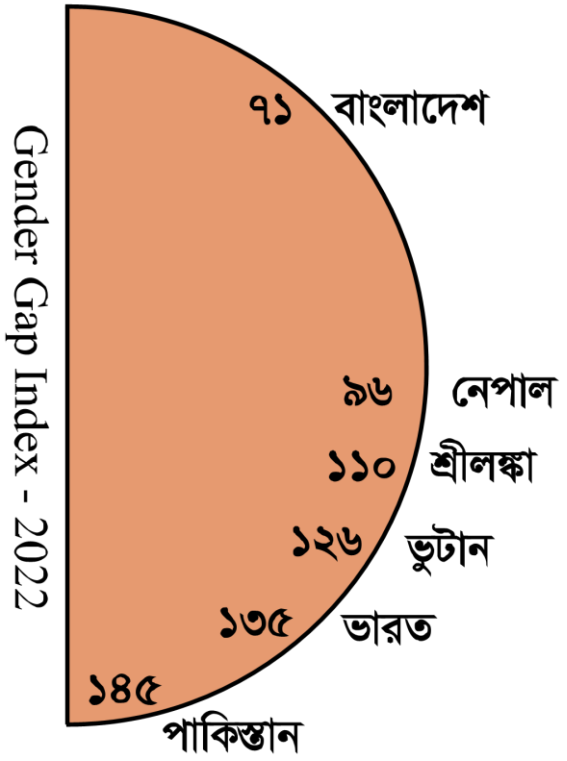

সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা
নারী ক্ষমতায়ন
অর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ
অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ
শিক্ষা
স্বাস্থ্য
রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ

- **নারীর উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ:** বর্তমান সরকার নারী উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ রেখেছে। ২০১৯ সালে ১০০ কোটি টাকা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ করে এছাড়াও ২০২১-২২ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় ৪১৯১ কোটি টাকা।

- **বৈশ্বিক নারী উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান:** বৈশ্বিক নারী উন্নয়নে জেন্ডার সমতায় বাংলাদেশ বর্তমানে ৭১তম এবং সেখানে পাকিস্তানের অবস্থান ১৪৫তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম এবং ১০০ এর নিচে দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশ নেই। [তথ্যসূত্র: World Economic Forum (WEF)]

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ

আরও যেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে উন্নয়ন করতে হবে

- **CEDAW এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন:** ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ CEDAW এর ৪টি অনুচ্ছেদে আপত্তি জানিয়ে অনুমোদন করেছিল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ২টি অনুচ্ছেদ থেকে আপত্তি তুলে নেয়। তবে এখনো ২টি অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের আপত্তি রয়ে গেছে। অনুচ্ছেদ দুটি হলো: ২ অনুচ্ছেদ (সর্বত্র সমান অধিকার) ও ১৬.১ (c) (বিবাহ বৈষম্য) অনুচ্ছেদ।

- **রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ:** সংসদের সাধারণ আসনে ২২ জন (৭% এর মতো) এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ৫ জন (২ জন পূর্ণমন্ত্রী) নারী। তাই নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আওতা বৃদ্ধি করতে হবে।

- **শিশু বিবাহ প্রতিরোধে আহবান গ্রহণ:** বাংলাদেশ শিশু বিবাহে বিশ্বে ৪র্থ অবস্থানে আছে। বাংলাদেশের আগে রয়েছে আফ্রিকার ৩টি দেশ। UNICEF এর তথ্যমতে, বাংলাদেশ এর ২২% নারী শিশুর বিয়ে হয় ১৫ বছরের আগে এবং ৫৯% শিশুর বিয়ে হয় ১৮ বছরের আগে।

- **মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ:** উত্তরবঙ্গের আদিবাসী নারীদের বেশি কর্মে নিযুক্ত করা হয় কারণ মজুরি কম দিতে হয়। তাই মজুরি বৈষম্য বিলোপের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ

বর্তমানে বাংলাদেশের নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

- **পোশাক খাত:** বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশেরও বেশি পোশাক শিল্পখাত থেকে আসে। মোট গার্মেন্টসকর্মীর প্রায় ৫৪ শতাংশ নারী। এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)-র জরিপ অনুযায়ী দেশের মোট ৪২ লাখ ২০ হাজার পোশাক শ্রমিকের মধ্যে নারীর সংখ্যা ২৪ লাখ ৯৮ হাজার। এই খাতে নিয়োজিত নারী কর্মী দেশের শিল্পখাতে নিয়োজিত মোট নারী কর্মীর ৭০ ভাগ।

- **প্রবাসী আয়ে নারী:** জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্যে, ১৯৯১ সাল থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৯ লাখ ৩৫ হাজার ৪৬৬ জন নারী প্রবাসে কাজ করতে গেছেন। প্রবাসী আয় প্রাপ্তির দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে সপ্তম। প্রবাসে বাংলাদেশি শ্রমিকদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১ লাখ ২১ হাজার ৯২৫ জন, যা মোট সংখ্যার ১২ দশমিক ৯ শতাংশ। তারা দেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

- **কৃষিখাত:** কৃষি তথ্য সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট কর্মক্ষম নারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কৃষিকাজে নিয়োজিত। নারী শ্রমশক্তির ৭১ দশমিক ৫ শতাংশ নিয়োজিত কৃষিকাজে। বিবিএসের ২০১৮ সালের তথ্য মতে, দেশের কৃষি খাতে নিয়োজিত আছে ৯০ লাখ ১১ হাজার নারী।

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ

- **চা শিল্প:** চা-শিল্পে নারীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চা-বাগানগুলোতে কাজ করা ১ লাখ ২২ হাজারের বেশি শ্রমিকের ৭০ ভাগই নারী। বাংলাদেশে ২০১৯ সালে ৯ কোটি ৬০ লাখ ৬৯ হাজার কেজি চা উৎপাদন হয়। চা উৎপাদনের ১৬৬ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ চা উৎপাদনের রেকর্ড হয় ২০১৯ সালে।

- **শিক্ষা খাত:** প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে নারীর জন্য ৬০ শতাংশ কোটা থাকলেও সেই সীমারেখা বেশ আগে অতিক্রম করেছে বাংলাদেশ। তবে মাধ্যমিকে শিক্ষক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ এখনো আশানুরূপ নয়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় এই হার নগণ্য।

- **সেবা খাত:** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, এই খাতে ৭ দশমিক ২ শতাংশ নারী। সেবা খাতে ৩৭ লাখ নারী কর্মরত।

- **নার্স:** ২০২০ সালে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পিএমআইএস তথ্য অনুযায়ী, দেশে পুরুষ নার্সের সংখ্যা মাত্র ৯ দশমিক ৪ শতাংশ। অর্থাৎ, ৯০ দশমিক ৬ শতাংশই নারী।

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ

- **পুলিশ:** পুলিশ সদর দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত নারীর সংখ্যা ১৫ হাজার ১৬৩ জন। তাদের মধ্যে ডিআইজি দুই জন, অ্যাডিশনাল ডিআইজি তিনজন, পুলিশ সুপার ৭১ জন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ১০৯ জন ও সহকারী পুলিশ সুপার ১০০ জন। এছাড়া ইন্সপেক্টর ১০৯, এসআই ৭৯৭, সার্জেন্ট ৫৮, এএসআই ১ হাজার ১০৯, নায়েক ২১১ এবং ১২ হাজার ৫৯৪ জন কনস্টেবলও নারী।

- **প্রশাসন:** প্রশাসন ক্যাডারে বর্তমানে ২৬ শতাংশ নারী। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চলতি বছরের হিসেব অনুযায়ী, ১৪৯ জন ইউএনও ছাড়াও বর্তমানে ১০ জন জেলা প্রশাসক (ডিসি), ৩৮ জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) এবং ১৭৩ জন সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে নারী কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া সচিবের মধ্যে ১১ জন নারী। ৫১১ জন অতিরিক্ত সচিবের মধ্যে নারী ৮৩ জন, ৬৩৬ জন যুগ্ম-সচিবের মধ্যে ৮১ জন নারী।

- **জিডিপিতে নারীর অবদান:** বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ২০২০ সালের এক গবেষণায় বলা হয়, মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) নারীর অবদান প্রায় ২০ শতাংশ। এর সঙ্গে সংসারের ভেতর ও বাইরের কাজের মূল্য ধরলে তাদের অবদান বেড়ে দাঁড়াবে ৪৮ শতাংশ। এর অর্থ হলো, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের অবদান সমান সমান।

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ

নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে সরকারের উদ্যোগ

- **বাজেট বরাদ্দ:** নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০৯ সালে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয় ২৭,২৪৮ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২,২৯,৪৮৪ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

- **নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধি:** সরকার নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জে জামানতবিহীন ও ১০ শতাংশ সুদে ঋণ প্রদান ব্যবস্থা চালু করেছে। এছাড়াও জয়িতা ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে যা বর্তমানে ১৮০০০ জন নারীকে সহায়তা প্রদান করছে।

- **স্বাস্থ্য সুরক্ষা:** সরকার নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দেশে ১৩০০০টিরও বেশি ম্যাটারনিটি সেন্টার স্থাপন করেছেন। শিশু এবং মায়েদের জন্য ৩০০০০ স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন, সরকারি এবং বেসরকারি কার্যালয়ে ডে-কেয়ার ব্যবস্থা চালু, এছাড়াও ৬ মাসের বেতন প্রদানসহ মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা করেছেন। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে মাতৃমৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। যেখানে ২০০৮ সালে মাতৃমৃত্যুহার ছিল হাজারে ৩২০ জন যা বর্তমানে ১৬৫ জনে নেমে এসেছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ

- **সামাজিক সুরক্ষা:** সরকার নারীদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, হিজরা ও বেদে সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এর আওতায় সর্বমোট ৪৭.২৩ লাখ নারীকে সুরক্ষা প্রদান করেছে।

- **নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে পদক্ষেপ:** সরকার নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে 'বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭', 'যৌতুক প্রথা নিরোধ আইন-২০১৮', 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০' ও নারী উন্নয়নের জন্য 'নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১' প্রণয়ন করে। এছাড়াও ধর্ষণ প্রতিরোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে ২০২০ সালে একটি নতুন আইন পাশ করে।

- **CEDAW তে স্বাক্ষর:** বাংলাদেশ পূর্বে ৪টি ধারা সংরক্ষণসহ CEDAW অনুসমর্থন করলেও বর্তমানে কেবল ২টি [২, এবং ১৬(১)(গ)] ধারায় সংরক্ষণ এবং অনুসমর্থনে রাজি হয়।

স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে তরুণ-তরুণী ও যুবসমাজকে প্রস্তুত করতে গবেষণা, উদ্ভাবন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়। এরই মধ্যে সাধারণ, কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও জীবনমুখী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে শিক্ষার সুযোগ তৈরি ও সম্প্রসারণে কাজ করা হচ্ছে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ ধারণা নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভবিষ্যতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও উদ্ভাবন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮০ হাজার তরুণ-তরুণীকে অগ্রসর প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বর্তমানে স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন উপযোগী অবকাঠামো গঠন ও সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশের যে রূপরেখা সরকার দিয়েছে সেখানে ৪টি কৌশলের কথা বলা হয়েছে। রূপরেখাগুলো হলো— স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট গভর্নমেন্ট। এই চার কৌশলসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবনে ১০০ কোটি টাকার এই বিশেষ তহবিল গঠন করা হচ্ছে, সেখানে মূলত অগ্রাধিকার পাবেন তরুণ-তরুণীরা।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

সর্বজনীন পেনশন

১ জুন ২০২৩ জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপনে বলা হয় ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে দেশে সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করবে সরকার। দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আনতে ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ জাতীয় সংসদে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল, ২০২৩' পাস হয়। এরপর ৩১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সর্বজনীন পেনশন স্কিম বা কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয় ১৭ আগস্ট, ২০২৩। ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সকল শ্রেণি পেশার বাংলাদেশি নাগরিক এই স্কিমে অংশ নিতে পারবে। স্কিম অনুযায়ী ব্যক্তির বয়স ৬০ বছর হলেই তিনি সরকার থেকে পেনশন পেতে শুরু করবেন্। কেউ যদি ৫৫ বছর বয়সে এসে স্কিমে অংশ নেন তাহলে ৬৫ বছর বয়সে থেকে তিনি পেনশন পেতে শুরু করবেন। অর্থাৎ কমপক্ষে টানা ১০ বছর চাঁদা দেওয়ার পর একজন ব্যক্তি পেনশন পাবেন। সরকার মোট ৬টি স্কিমের কথা ঘোষণা করেছে। তবে আপাতত চালু হয়েচে ৪টি স্কিম। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে- প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা।

স্কিমের নাম	যাদের জন্য	মাসিক চাঁদার হার (টাকা)
প্রবাস	প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য	৫ হাজার/৭.৫ হাজার/ ১০ হাজার
প্রগতি	বেসরকারি চাকুরীজীবীদের জন্য	২ হাজার/ ৩ হাজার/ ৫ হাজার
সুরক্ষা	স্বনির্ভর ব্যক্তির জন্য (ফ্রিল্যান্সার, কৃষক, শ্রমিক)	১ হাজার/ ২ হাজার/ ৩ হাজার/ ৫ হাজার
সমতা	দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য। যাদের বার্ষিক আয় ৬০ হাজার তারাই কেবল এ স্কিমের অন্তর্ভুক্ত হবেন।	এই স্কিমে চাঁদার হার একটিই ১ হাজার টাকা। তবে এক্ষেত্রে ব্যক্তি দেবে ৫০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা দেবে সরকার।

নতুন মুদ্রানীতি

১৮ জুন, ২০২৩ বাংলাদেশ ব্যাংক জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। এতে মূল্যস্ফীতি নিয়েন্ত্রণে রেপোহার বৃদ্ধি এবং ব্যাংক ঋণের সুদহারের সীমা তুলে নেওয়া হয়। ২০২০ সালের এপ্রিলে ঋণের সুদহার ৯% বেধে দিয়েছিল সরকার। ১ জুলাই, ২০২৩ থেকে কার্যকর হওয়া নতুন ঋণের সুদহার- সিএমএসএমই ও ব্যক্তিগত খাত ১১.১৩%, কৃষি ৯.১৩% এবং অন্যান্য ১০.১৩%।

বিষয়	বর্তমান (%)	নতুন (%)		বিষয়	বর্তমান (%)	নতুন (%)
ব্যাংক ঋণের সুদ	৯	১০.১২		সরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধি	৩৭.৭	৪৩
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	১১	১২.১২		বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধি	১৪.১	১০.০৯
রেপো সুদ	৬	৬.৫০		অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি	–	১৬.৯
রিভার্স রেপো	৪.২৫	৪.৫০				

দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত GI পণ্য

০৮ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত DPDT ১৭টি বাংলাদেশি পণ্যের GI নিবন্ধন দেয়। প্রথম GI পণ্য হিসেবে নিবন্ধন সনদ পায় 'জামদানি শাড়ি' ১৭ নভেম্বর ২০১৬ সালে। ২০১৭ সালে দ্বিতীয় পণ্য হিসেবে 'বাংলাদেশ ইলিশ'এবং সর্বশেষ ০৮ আগস্ট, ২০২৩ সালে ১৭তম পণ্য হিসেবে GI সনদ পায় 'নাটোরের কাঁচাগোল্লা'।

	পণ্য	সনদ প্রদান	সনদ প্রাপ্তির প্রতিষ্ঠান
০১	জামদানি শাড়ি (প্রথম)	১৭ নভেম্বর, ২০১৬	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (BSCIC)
০২	ইলিশ	২৪ আগস্ট, ২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর (DoF)
০৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জের ক্ষীরশাপাতি আম	২৭ জানুয়ারি, ২০১৯	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)
০৪	মসলিন কাপড়	২৮ ডিসেম্বর, ২০২০	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (BHB)

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

	পণ্য	সনদ প্রদান	সনদ প্রাপ্তির প্রতিষ্ঠান
০৫	রাজশাহীর সিল্ক	১৭ জুন, ২০২১	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (BSDB)
০৬	রংপুরের শতরঞ্জি		বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (BSCIC)
০৭	কালিজিরা চাল		বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)
০৮	দিনাজপুরের কাটারীভোগ চাল		বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)
০৯	নেত্রকোণার সাদামাটি		নেত্রকোণা জেলা প্রশাসনের কার্যালয়
১০	বাগদা চিংড়ি	২৪ এপ্রিল, ২০২২	মৎস্য অধিদপ্তর (DoF)
১১	ফজলি আম	জানুয়ারি, ২০২৩	ফল গবেষণা ইনস্টিটিউট
১২	তুলশীমালা চাল	জুন, ২০২৩	শেরপুর জেলা প্রশাসন

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

	পণ্য	সনদ প্রদান	সনদ প্রাপ্তির প্রতিষ্ঠান
১৩	চাপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম	২৫ জুন, ২০২৩	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব ও গবেষণা কেন্দ্র, চাপাইনবাবগঞ্জ
১৪	চাপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম		আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব ও গবেষণা কেন্দ্র, চাপাইনবাবগঞ্জ
১৫	বগুড়ার দই		বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, বগুড়া জেলা শাখা
১৬	বাংলাদেশের শীতলপাটি	২০ জুলাই, ২০২৩	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (BSCIC)
১৭	নাটোরের কাচাঁগোল্লা (সর্বশেষ)	০৮ আগস্ট, ২০২৩	নাটোর জেলা প্রশাসন

পদ্মা সেতুর প্রভাব

- ✓ সুন্দরবনে দেশি পর্যটক বেড়েছে ৪৫%।
- ✓ বিগত বছরে বিদেশি পর্যটক দ্বিগুণ হয়েছে।
- ✓ সুন্দরবন পর্যটনে নতুন নতুন জাহাজ যুক্ত হচ্ছে।
- ✓ ঢাকা থেকে খুলনার যাওয়ার সময় কমেছে।
- ✓ এক বছরে মংলা বন্দর দিয়ে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে তিনগুণ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৯৮ টন পোশাক রপ্তানি হয়েছে।
- ✓ রাজধানী থেকে মংলা বন্দরের দূরত্ব ১৭০ কিলোমিটার। ফলে এই বন্দরটি হবে রাজধানী থেকে সবচেয়ে কাছের বন্দর।
- ✓ ২০২৩ সালের ১৫ জুন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ সেতুটি থেকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা টোল আদায় করেছে। প্রতিদিন গড়ে ১৫ হাজার যানবাহন চলাচল করছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

পদ্মা সেতুর পরীক্ষামূলকভাবে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন

- ✓ টোল আদায় আরো সহজ করার জন্য পদ্মা সেতুর পরীক্ষামূলকভাবে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ইটিসি) কার্যক্রম চালু হচ্ছে।
- ✓ এ পদ্ধতিতে সেতুর দুই প্রান্তে একটি করে লেনে ইটিসি বুথ থাকবে। আর গাড়িতে থাকবে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) কার্ড। এই কার্ডের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে টোল আদায় হবে। প্রয়োজন হবে না ক্যাশ লেনদেন, থামতে হবে না টোল প্লাজায়। নিবন্ধন করা যেকোনো যানবাহন টোল প্লাজার মাধমে এলে ক্যামেরার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় টোল আদায় হবে। তিন-চার সেকেন্ডের মধ্যে টোল প্রদান শেষে গাড়ি সেতুতে উঠে যাবে।

পদ্মা রেল সেতু

- ✓ ৪ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে পদ্মা সেতু দিয়ে ১ম বারের মতো পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল করে।
- ✓ সেপ্টেম্বরে ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ৮২ কিলোমিটার অংশে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করবে। বর্তমানে ঢাকা হতে খুলনার দূরত্ব ৪৬০ কিলোমিটার। পদ্মা সেতু হয়ে যশোর রেলপথে যাতায়াতে রাজধানী থেকে খুলনার দূরত্ব কমবে ২১২ কিলোমিটার।
- ✓ দেশের প্রথম পাথরবিহীন রেলপথ হচ্ছে পদ্মা রেল সেতু।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে অবদান রাখবে?

- ✓ জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ২% এর অধিক বৃদ্ধি
- ✓ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছাবে অর্থাৎ দেশে ১০০% বিদ্যুতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, এতে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণে সহয়ক হবে।
- ✓ দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের মনোপলি হতে মুক্তি।
- ✓ দেশে দ্রুত শিল্পায়নে সাহয্য করবে।
- ✓ বাংলাদেশে নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি যোগ হওয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী বিরাট অগ্রগতি ঘটবে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

❑ বাংলাদেশে এখন যথেষ্ট পরিমাণ জ্বালানি আমদানি হচ্ছে। কয়লা, গ্যাস, আমদানি করে বিদ্যুৎ তৈরির মহপরিকল্পনা করা হয়েছে। জ্বালানি তেল আমদানি করে আগে থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। এর মধ্যে পরমাণু শক্তিও যুক্ত হচ্ছে। এটা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক, নাকি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে?

বর্তমানে বাংলাদেশ ভিশন ২০২১, এসডিজি ২০৩০ এবং ভিশন ২০৪১- এর লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট নির্ধারণ করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদার আলোকে বর্তমান সরকার ২০১০ সালে Power System Master Plan হালনাগাদ করে। পরবর্তীকালে ২০৪১ সালের Country Vision-কে অন্তর্ভুক্ত করে ২০১৬ সালে পুনরায় Power System Master Plan হালনাগাদ করে, যেখানে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে একক জ্বালানি অর্থাৎ প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে বহুমুখী জ্বালানি ব্যবহারকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, মূল্য সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব হওয়ায় বিশ্ব জ্বালানি মিশ্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি হবে একটি বেইজলোড বিদ্যুৎকেন্দ্র, যা ২৪ ঘন্টা চলবে। কেন্দ্রটি চালু হলে দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ফলে কলকারখানা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল হবে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ২০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে। এতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি প্রায় ২% বাড়বে। এভাবে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

অর্থনীতিতে কর্ণফুলী টানেলের প্রভাব

- চট্রগ্রাম শহরে নিরবচ্ছিন্ন ও যুগোপোযুগী সড়ক যোগাযোগ ব্যাবস্থা গড়ে তোলা এবং বিদ্যমান সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন হবে।
- এশিয়ান হাইওয়ের সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে।
- কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা শহরের সাথে ডাউন টাউনের সাথে যুক্ত হবে এবং উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিতকরণ।
- চট্রগ্রাম পোর্টের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ এবং প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিতকরণ করা।
- ঢাকা-চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এর মধ্যে নতুন একটি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- কর্ণফুলী টানেল নির্মিত হলে চীনের সাংহাই শহরের ন্যয় চট্রগ্রাম শহরকে “One City Two Town” মডেল এ গড়ে তোলা।
- DPP মোতাবেক এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে Financial এবং Economic IRR এর পরিমান দাঁড়াবে যথাক্রমে ৬.১৯% এবং ১২.৪৯%। তাছাড়া, Financial ও Economic “Benefit Cost Ratio (BCR)” এর পরিমান দাড়াবে যথাক্রমে ১.০৫ এবং ১.৫০ । ফলে কর্ণফুলী টানেল নির্মিত হলে জিডিপি তে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অর্থনীতিতে মেট্রোরেলের প্রভাব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। দেশের সম্পূর্ণ জিডিপিতে ঢাকার অবদান প্রায় ৩৬ শতাংশ। ঢাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৫০ হাজার। ২০১২ সাল পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৯ হাজার ২৫৫টি। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে ২০ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৪১টিতে উন্নীত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর সড়ক ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬.১২ কিলোমিটার মাত্র। উভয়ের প্রভাবে ঢাকা মহানগরীতে যানজট তীব্র আকার ধারণ করেছে এবং ক্রমাবনতি হচ্ছে। এই যানজট এবং এর ফলশ্রুত প্রভাবে বার্ষিক প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করছেন। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, MRT Line-6 এর সম্পূর্ণ অংশ চালু হওয়ার পর মেট্রোরেল পরিচালনাকালে দৈনিক Travel Time Cost বাবদ প্রায় ৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা এবং Vehicle Operation Cost বাবদ প্রায় ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে। এই সাশ্রয়কৃত অর্থ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। GDP Growth Rate বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রভাব

যানজট নিরসনে নেয়া সবচেয়ে বড় এই প্রকল্পের সংযোগ সড়কসহ দৈর্ঘ্য ৪৬.৭৩ কিলোমিটার। এক্সপ্রেসওয়েটিতে ১১টি টোল প্লাজা থাকবে। যার পাঁচটিই এক্সপ্রেসওয়ের উপরে। এর উপর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৮০ হাজার যানবাহন চলাচল করতে পারবে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি ঢাকার উত্তর-দক্ষিণে বিকল্প সড়ক হিসেবে কাজ করবে।

অর্থনীতিতে কক্সবাজার-দোহাজারী রেল প্রকল্পের প্রভাব

এই প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সঙ্গে ঢাকার সরাসরি রেলওয়ে সংযোগ স্থাপন হবে। এ রুটে রেল চলাচল শুরু হলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে রেলওয়ের অংশীদারিত্ব বাড়বে বলে প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার করিডোরের সঙ্গে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে করিডোরকে যুক্ত করা সম্ভব হবে।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী প্রভাব ফেলছে তা বর্ণনা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
- 'টেকসই উন্নয়ন'-এর ধারণাটি ব্যাক্যা করে বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকার জন্য এর গুরুত্ব ও উপায় বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে এনজিও-র ভূমিকা আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- "পৃথিবীতে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর
  অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।" [৪১তম বিসিএস]

  জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই উক্তিটির সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটের কতটা মিল রয়েছে? নিজের ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করুন।
- বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর মর্যাদা ও নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন। বাংলাদেশের বাস্তবায়িত মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনাসমূহের ইতিবৃত্ত উপস্থাপন করুন। [২৯তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া। [২৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম। [২৪তম বিসিএস]
- বাজার অর্থনীতি কী? বাংলাদেশের জন্য তা কতদূর সমর্থনযোগ্য যুক্তি দিন। [২০তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে কখন প্রথম মহিলা বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হয়? উক্ত বিচারপতির নাম এবং সংক্ষেপে পেশাগত জীবনী লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]
- নারীর ক্ষমতায়নে বর্তমান সরকারের ৫টি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ কী? [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের উদ্যোগগুলি আলোচনা করে আরও কোনো নতুন উদ্যোগের সুপারিশ করেন কি? কী কী? বর্ণনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। গৃহীত পদক্ষেপগুলো CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Woman) সমর্থন করে কি? [৩১তম বিসিএস]
- জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন বলে মনে করেন? আলোচনা করুন। [২৮তম বিসিএস]

1. পরিবেশ / সংরক্ষণ (Gra, Fig)

2. SDG — Ed development — Graph

3. কৃষি

4. জনগণ (Fig)

5.

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়